দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা।। ১১ মে, ২০২৬
২৭ বৈশাখ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮
website : www.eswastika.com

ম্যান অফ দ্য সিরিজ নির্বাচন কমিশন

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতেই পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া ঝড়

— পৃঃ ১৩

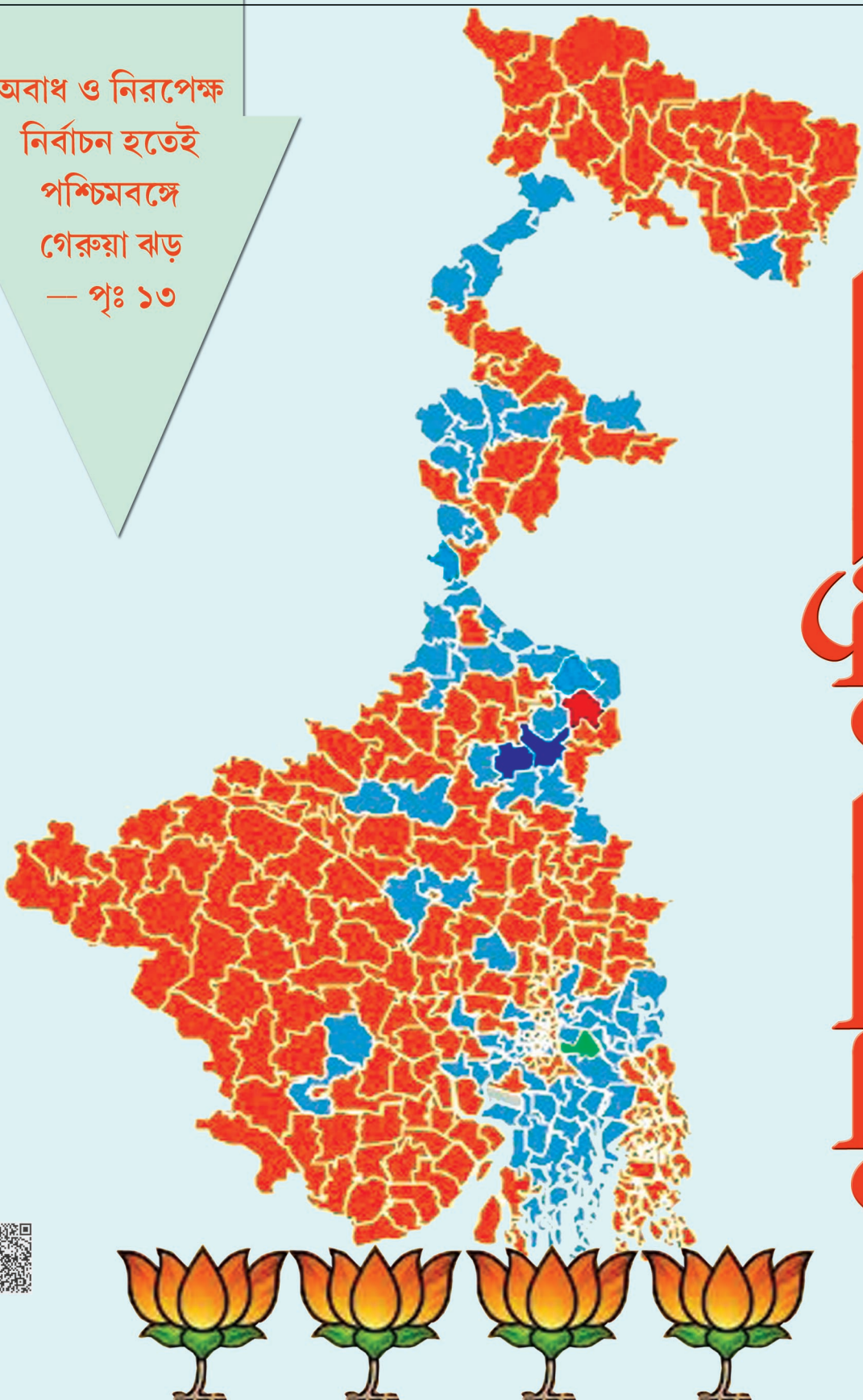

পলাশতলে পশ্চিমবঙ্গ

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ২৭ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

১১ মে - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

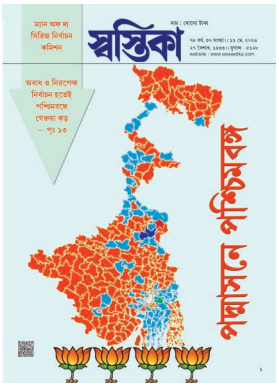

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

বিজয়ী কর্মশক্তির ভিতর দিয়েই রাজ্যে ধর্মরক্ষা আর বৈভবপূর্ণ জাতীয় সমাজ গঠন সম্ভব 'পরং বৈভবং' ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

১৯৪০ সালে এই ফল লেখা হয়েছিল কলকাতার বালিগঞ্জে ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জেহাদি শক্তির রমরমা ঘুচে গেল ☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ৮

মাফিয়ারাজ অবসানের পর বঙ্গ সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠাই হলো সময়ের দাবি ☐ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ☐ ১১

ম্যান অব দ্য সিরিজ নির্বাচন কমিশন—অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতেই পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া ঝড় ☐ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ☐ ১৩

বঙ্গ রাজনীতির অঙ্গ পরিবর্তন—তমসো মা জ্যোতির্গময় ☐ অম্লান কুসুম ঘোষ ☐ ১৫

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে জনমতের বিস্ফোরণ—বাঙ্গালি হিন্দুর স্বাধীনতার অনুভূতি ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১৭

তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে ☐ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ☐ ২০

ফলহারিণী পূজার মাহাত্ম্য উপলব্ধিতে মনুষ্যজীবন লাভ করে দিব্য জীবনের সন্ধান ☐ রজতশুভ্র রায় ☐ ২৩

যে গান দেশকে মা করে তুলল—বঙ্কিমচন্দ্রের অমর দান বন্দে মাতরম্ ☐ ড. জয়দেব বিশ্বাস ☐ ২৫

নিউইয়র্কে কেরালার খাদ্য সম্ভার ☐ কৌশিক রায় ☐ ২৭

হারানো পত্রিকা—নবীন লেখকদের আঁতুড়ঘর জাহ্নবী ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

ত্রিপুরার শেষ রাজা মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ৩৪

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি—দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়লো বাংলাদেশ ☐ ৩৫

নেতাজীর জীবন ভাষ্যে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান ☐ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি ☐ ৩৭

'মে দিবস'-এর প্রোপাগান্ডা মার্ক্সবাদের নৃশংস স্বরূপ ঢাকতে চায় ☐ পিন্টু সান্যাল ☐ ৪৩

বিগত সাত দশকে রাজনৈতিক আনুগত্যে গ্রাম ও শহরের বৈপরীত্য ☐ ডাঃ মধুসূদন পাল ☐ ৪৮

তৃণমূল নেত্রীর দুর্গে ফুটল পদ্ম ☐ বিপ্লব বিকাশ ☐ ৪৯

গল্প কথায় ডাক্তারজী ☐ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **চিঠিপত্র : ১৯** ☐ **অঙ্গনা : ২১** ☐ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ☐ **খেলা : ৩৯**

☐ **সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০** ☐ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ☐

প্রকাশিত হবে
১৮ মে
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৮ মে
২০২৬

সুশাসনের প্রত্যাশা

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন রাজ্যবাসীর কাছে কার্যত দ্বিতীয় স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। নতুন সরকারের কাছে রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা মুখ্যত কর্মসংস্থান, নারী নিরাপত্তা, শিল্পায়ন, উন্নত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা। কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত নয়, সমন্বয়ের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নে গতি আসুক, মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হোক— এটাই সময়ের দাবি।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এসব বিষয়েই আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০্) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অপশাসনের অবসান

অপশাসনের অবসান হইল। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যাকাশে অপশাসনের আরম্ভ সেই বাম শাসনকাল হইতে। চৌত্রিশ বৎসরের রক্তাক্ত অপশাসন পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে রক্তাক্ত করিয়াছে। মরিচঝাঁপির হিন্দু শরণার্থীদিগের উপর হইতে শুরু করিয়া বিজনসেতুতে আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা, সাঁইবাড়ি, নানুর, জাঙ্গিপাড়া, ছোটো আঙ্গারিয়া, নন্দীগ্রাম, নেতাই-সহ আরও বহু স্থানে লালসন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক নিরীহ মানুষের হত্যা পশ্চিমবঙ্গবাসী আজও বিস্মৃত হন নাই। ইহা ব্যতীত দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসরের শাসনে তাহারা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, কৃষি সবকিছুরই ধ্বংস সাধন করিয়াছে। একটি প্রজন্মকে তাহারা ভারত-বিরোধী মানসিকতায় পর্যবসিত করিয়াছে। অবশেষে রাজ্যবাসী সেই অপশাসনের অবসান ঘটাইয়াছে। বড়ো আশা করিয়া মানুষ তৃণমূল দলকে শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই মানুষের মোহভঙ্গ ঘটিল। বামেদের রক্তাক্ত শাসনকেও ইহারা ম্লান করিয়াছে। কংগ্রেসের উপজাত এই দলটির না ছিল কোনো রাজনৈতিক আদর্শ, না ছিল কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা। শুধুমাত্র লুণ্ঠন করিবার জন্যই দলটির সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের দলনেত্রী। ক্ষমতাসীন হইবার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহাদের নেতা-মন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া দলের চুনোপুঁটি পর্যন্ত নানাবিধ দুর্নীতিতে লিপ্ত হইয়াছিল। ইহার খতিয়ানও খুবই দীর্ঘ। তাহার ফলে ইহাদের শিক্ষামন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া বহুজনকে শ্রীঘরে বাস করিতে হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, ইহাদের শিক্ষামন্ত্রী যোগ্য চাকুরি প্রার্থীদের চাকুরি চুরি করিয়া তাহা অযোগ্যদের নিকট বিক্রয়-পূর্বক কোটি কোটি টাকা ও গহনাপত্র তাঁহার বান্ধবীর বাড়িতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ ও হত্যাও সমানভাবে চলিতেছিল। সম্পূর্ণ রাজ্যকে ইহারা নৈরাজ্যে পরিণত করিয়াছিল। এই সবই চলিতেছিল ইহাদের নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অঙ্গুলিহেলনেই। ইহার জন্যই রাজ্যের এক প্রবীণ রাজনীতিক তাঁহাকে সিপিআই(এম)-এর সেরা ছাত্রী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন। সার্থক তাঁহার সেই মন্তব্য। ইহাদের দলনেত্রীর আরও একটি অপকীর্তি হইল— বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের যাবতীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধা-সহ নানাবিধ পরিচয়পত্র প্রদান এবং এই জেহাদি শক্তিকে ব্যবহারপূর্বক হিন্দুদিগের জীবন-জীবিকাকে বিপন্ন করা। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর উসকানিতে যেকোনো অজুহাতে জেহাদিরা কীভাবে এরাজ্যের হিন্দুদের বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহার সহিত কোটি কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করিয়াছে, তাহা সমগ্র দেশ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অবশ্য পাঁচ বৎসর পূর্বেই এই নৈরাজ্যের বিদায় নিশ্চিত করিয়াছিল কিন্তু নানা অপকৌশল অবলম্বন করিয়া তাহারা ক্ষমতা পুনর্দখল করিয়া সেই অপশাসন অব্যাহত রাখিয়াছিল। এবারের নির্বাচনে তাহারা আর সেই সুযোগ পায় নাই। পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত জনতা আর তাহাদের সেই সুযোগ প্রদান করিবার অবকাশ প্রদান করে নাই।

এই নৈরাজ্যের অবসানে ভারতের নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে। তাহারা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন করিয়া কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন-পূর্বক নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন করিয়াছে। তাহার জন্য মানুষ ভয়শূন্য হইয়া ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিয়াছেন। আরও একদল রাষ্ট্রভক্ত, সমাজসেবক মানুষকে ধন্যবাদ জানাইতে হইবে যাহারা কয়েক মাস যাবৎ শহরে, গ্রামে, গঞ্জে, পাড়ায়-পাড়ায় মানুষের দ্বারে-দ্বারে গিয়া জনজাগরণ ঘটাইয়াছেন। মানুষকে তাঁহারা এই নৈরাজ্যের বিষয়ে সচেতন করিয়াছেন। তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনুভব করিয়াছেন, পনেরো বৎসরের স্বৈরাচারী শাসন এই রাজ্যকে দেশের সবচাইতে পশ্চাদপদ রাজ্যে পরিণত করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজ অনুভব করিয়াছে, এই অপশাসন চলিতে থাকিলে পশ্চিমবঙ্গ আগামী পাঁচ বৎসরে 'পশ্চিম বাংলাদেশ'-এ পরিণত হইবে। কেননা পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তার সহিত সমগ্র দেশের নিরাপত্তা জড়িত রহিয়াছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় লাভ শুধু একটি দলের নহে, তাহা পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত জনতার জয়। এই জয়লাভ পশ্চিমবঙ্গবাসীর দ্বিতীয় স্বাধীনতা লাভ। এই জয়লাভে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আশীর্বাদের বাস্তবায়ন ঘটিয়াছে। এই জয়লাভে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মা শান্তি লাভ করিয়াছে। এই জয়লাভে পশ্চিমবঙ্গের রাহুমুক্তি ঘটিয়াছে। চৌত্রিশ বৎসরের বামেদের অপশাসন এবং তৃণমূলের পনেরো বৎসরের নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়াছে।

সুভাষিতম্

রাজ্ঞো হি ব্রতমুত্থানং যজ্ঞঃ কার্যানুশাসনম্।
দক্ষিণা বৃত্তিসাম্যং চ দীক্ষিতস্যাভিষেচনম্।।

অর্থ ঃ প্রজাদের সতত বিকাশ সাধনই রাজার ব্রত। লোককল্যাণের জন্য কাজ করাই তাঁর ব্রত। ন্যায়পূর্ণ শাসন প্রদান তাঁর মুখ্য দায়িত্ব। প্রজাদের প্রতি সমান ব্যবহার করাই তাঁর দক্ষিণা। এইপ্রকার রাজার অভিষেক প্রকৃতপক্ষে লোক সেবার জন্যই হয়ে থাকে।

বিজয়ী কর্মশক্তির ভিতর দিয়েই রাজ্যে ধর্মরক্ষা আর বৈভবপূর্ণ জাতীয় সমাজ গঠন সম্ভব

‘পরং বৈভবং’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

প্রায় সাত দশকের অন্ধকার কেটে রাজ্যে আলো বেরিয়ে এসেছে। রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক শক্তির প্রতি রাজ্যবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনের ঝড়ে উড়ে গিয়েছে অন্যায় শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। এই ঝড়ে গত ৪ মে দেশবিরোধী বিদেশি বাম আর কংগ্রেসও উড়ে যায়। তৃণমূল শাসনের শোচনীয় পতনের ইঙ্গিত তিন মাস ধরে রাজ্যপাটে তুলে ধরা হচ্ছিল। বলা হচ্ছিল যে, তৃণমূল ১০০ আসনের নীচে নেমে যাবে। তৃণমূলের কাছে তা হবে আসন প্রাপ্তির নিরিখে এরাজ্যের তৃতীয় রাজনৈতিক দলে পরিণত হওয়ার শামিল। এটা বাস্তব করতে হিন্দু ঐক্যের আশু প্রয়োজন। রাজ্যপাটে প্রকাশিত নিবন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, এরাজ্যে বিজেপি থাকবে প্রথম সারিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। ভোটের ফলাফলেও তারই প্রতিফলন ঘটেছে। এবারের নির্বাচনে ভোটদানের হার ৯৩ শতাংশ, অর্থাৎ এবারের ভোটে ১০০-র ভিতর ৯৩ জন ভোটার জানিয়েছিলেন তারা কী ধরনের শাসক চান। কাকে বাতিল করতে চান। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে এবারের ভোটদান সর্বকালীন রেকর্ড। জনমতে স্পষ্ট হয়েছিল বাতিল হবে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। লম্বা দুর্নীতির ফর্দ নিয়ে ১৫ বছর ধরে মানুষের মাথায় তারা পা দিয়ে হাঁটছিল। তাদের নেতা-নেত্রীদের নাম লিখতেও এখন ঘৃণা বোধ হচ্ছে। ফলতার নির্বাচন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে হিন্দুদের ওপর তৃণমূলের ভয়াবহ অত্যাচার আর দুর্নীতি। পানিহাটির ডাঃ অভয়া, কালীগঞ্জে ছোট্ট তামান্নার মৃত্যু, মোথাবাড়ি আর সন্দেশখালি জানিয়েছিল রাজ্যকে কেন তৃণমূল বিষ থেকে মুক্ত করা দরকার । তাদের নেত্রী যে কেবল একজন হঠাৎ গজিয়ে নেতা বই কিছু নয়, ২০২১ ও ২০২৬-এ বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী তাকে দু'বার হারিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

তৃণমূলের পতনে অন্ধকার কেটে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বারবার বলেছেন কীভাবে তা স্বাভাবিক পথেই হবে। তৃণমূল ছিল পাপের ঘর। তাই বড়ো। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এবং এরাজ্যে অতীব শক্তপোক্ত বিরোধী দল বিজেপির কাছে তৃণমূল কংগ্রেস কোনো রাজনৈতিক শক্তি ছিল না। তার প্রমাণ তাসের ঘরের মতো তাদের ভেঙে পড়া। কিছু উঞ্ছ আর বশংবদ, দালালির সংবাদমাধ্যম তাতে স্বপ্নিল রং দিয়েছিল। সেই জেহাদিদের আলাদা করার সময় এসেছে। তাদের ঘরের বাইরে রাখতে হবে। এটা ঠিক যে, তারা পালাবে। তবে বেশি দূর নয়। ফিরে আসবেই অন্যরূপ ধরে। দুরাত্মাদের ছলের অভাব নেই। এরাজ্যের সংবাদমাধ্যমের ভিতরেই সেই কুলাঙ্গাররা লুকিয়ে রয়েছে। কেউ-বা আবার সনাতনী বুদ্ধিজীবীর ভেক ধরে প্রবেশের তালে রয়েছে। তৃণমূলের নোংরা হাত থেকে গ্রহণ করা পুরস্কার নিয়ে সে অনুগ্রহীর দল আবার বন্ধু সেজে হিন্দু বিরোধিতার কাজে নামবেই। কারণ সেটাই তাদের নিম্নবৃত্তি । এই দেশবিরোধী জেহাদি পশুদের এবার চিনে নিয়ে ফারাক করতে হবে। নজরে রাখা দরকার যে একটি রক্তবীজও যাতে পবিত্রতার আঙিনায় প্রবেশ করতে না পারে। যাদের স্থান হওয়ার কথা ছিল গরাদের আড়ালে আজ এতদিন তারা শাসকের আসনে দোসর ছিল। জনস্রোত, জনরোষ আর জননির্ণয়ে সে আসন ভেসে গিয়েছে। তাই এবার ওই জেহাদিদেরও ভাসিয়ে দিতে হবে। এটাই সাবধানবাণী।

তৃণমূলের হাওয়া বেলুন থেকে হাওয়া বের করতে বিজেপিকে যে খুব একটা বেগ পেতে হয়েছে তা নয়। তবে মিথ্যার জাল আর তৃণমূলের দুঃশাসনীয় অধর্মনীতির বিরুদ্ধে তাদের কঠিন লড়াই করতে হয়েছে। যদিও জানা ছিল যে, ধর্মের জয় নিশ্চিত। মহাভারতে উল্লেখিত হয়েছে— ‘যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ’। আর ঠিক তাই হলো । রাজ্যে যে নতুন সূর্যোদয় ঘটল তার ছটায় আলোকিত হয়ে বিজেপিকে এবার এগিয়ে চলতে হবে যাতে সমগ্র রাজ্যের বৈধ ভোটার আর নাগরিকদের জীবনের উৎকর্ষ লাভের লক্ষ্যে মঙ্গলের সাধনায় ব্রতী করা যায় । ঐহিক পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে মানসিক স্ফুরণেই সে বৈভব ঘটে। পশ্চিমবঙ্গ আর বাঙ্গালি মানসিকতার ভিতরেই রয়েছে সে সুপ্তবীজ । সে ঐতিহ্যকে সামনে তুলে ধরে পথ চলতে হবে পশ্চিমবঙ্গের নতুন শাসক বিজেপিকে। বিজেপি নেতৃত্ব তা ভালোই জানেন। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের ‘হিন্দু হোমল্যান্ড’ বা হিন্দু রাজ্য তৈরির ব্রতের মধ্যে দিয়ে প্রতিবেশী দেশ ‘বাংলাদেশ’-এর জেহাদি জামাতের উত্থানের আগুন নির্বাপিত হবে। মিথ্যা আর অন্যায়ের ভিতর দিয়েই চলছিল তৃণমূল কংগ্রেস। হন্যে হয়ে তাদের বাতিল বা ঝেড়ে ফেলার রাস্তা খুঁজছিল ভোটার আর মানুষ। অনেকদিন আগেই মানুষ তাদের বাতিলের দলে ফেলে দিয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের অসাধারণ ভূমিকায় ক্রোধের সে বন্ধ মুখ খুলে যায়। তৃণমূল কংগ্রেস ১০০ আসনের নীচে নেমে যায় আর বিজেপি ২০০ আসনের উপর উঠে আসে। বিজেপি নিজের কর্মশক্তির ভিতর দিয়ে এরাজ্যে প্রতিষ্ঠা পেল। তাই আদর্শনিষ্ঠাকে সামনে রেখে তাদের চলতেই হবে। আশা রাখি তা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

১৯৪০ সালে এই ফল লেখা হয়েছিল কলকাতার বালিগঞ্জে

হেরে ভূতেষু দিদি,

আপনাকে দেখে আমার ভালো লাগল না। আপনি যখন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে বের হয়ে এলেন তখন আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর তখনই ভাবছিলাম আপনাকে এই চিঠিটা লিখব। ইতিহাসের আশপাশ দিয়ে হাঁটা তো আপনি জানেনই না। চিরকাল তো মিথ্যা শিখেছেন ও শিখিয়েছেন। আসুন, আজ আপনাকে একটু ইতিহাস শোনাই।

স্বাধীনতার পর থেকে আপনার আমল পর্যন্ত এই পশ্চিমবঙ্গ অত্যাচারী কিংবা তাদের সমর্থকদের হাতে ছিল। এবারেও আপনার দল বা অন্য বিরোধী দলের যাঁরা জিতেছেন একটি হিসেব করে দেখুন সবাইকে মুসলমানরাই জিতিয়েছে। নয় ভোট কেটে, নয় ভোট দিয়ে। ভারতকে যাঁরা মা মনে করে বন্দে মাতরম্ গাইতে যাঁদের লজ্জা করে না, সেই 'সাম্প্রদায়িক' হিন্দুরাই এবার পশ্চিমবঙ্গের ফল ঠিক করে দিয়েছে।

যাই হোক, এবারে যে ইতিহাস আপনাকে শোনাব তাতে দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা হিসেবে আপনার লজ্জা হবে। হিন্দুকে 'হিন্দু হিন্দু' জপ করানোর মহান ব্রত নিয়েছিলেন আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। ঠিক ধরেছেন, আপনি যাঁদের সাহায্য নিয়েও সাম্প্রদায়িক বলেন সেই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন ১৯৪১ সালে। তার বছর খানেক আগে থেকেই তিনি একজন নেতার সন্ধান করছিলেন যিনি হিন্দুদের রক্ষক হয়ে উঠতে পারেন। এমন এক নেতা যাঁর মধ্যে ছত্রপতি শিবাজীর মতো অকুতোভয় শক্তি রয়েছে।

এমন ব্যক্তিত্ব তিনি খুঁজে পেলেন দক্ষিণ কলকাতা থেকেই। ১৯৪০ সালের ২৬ আগস্ট। জন্মাষ্টমীর দিন সর্বদা হিন্দুর পাশে দাঁড়াবেন যিনি সেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আপন মাল্যে বরণ করে নিলে স্বয়ং যুগাচার্য। নিজের শক্তি সঞ্চারিত করলেন শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে। বাঙ্গালির জন্য একেবারে শিবাজীর মতো এক নেতা তৈরি করে গেলেন। এখানেই শেষ নয়। এবার কাহিনিটা চলে যাবে গঙ্গা পারের আর এক পবিত্র ও ঐতিহাসিক শহর বারাণসীতে। ১৯৪০ সালেরই দুর্গাষ্টমীর দিনে শৈবপীঠ বারাণসীতে রুদ্ধদ্বারে ডেকে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন। আচার্যদেবের জীবনীকার স্বামী বেদানন্দ 'শ্রীশ্রী যুগাচার্য জীবনচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন, 'শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টা ও সাফল্য মেবারের মহারাণা প্রতাপ অথবা মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজীর কীর্তির সহিত তুলনীয়।' স্বামী বেদানন্দ আরও লিখেছেন, ''আচার্যের আশীর্বাদ শক্তিসমৃদ্ধ শ্যামাপ্রসাদের অন্তরে সুপ্ত সিংহ গর্জন করিয়া উঠিল। বঙ্গের তথা সমগ্র ভারতের নেতাদের বিরুদ্ধে তিনি একক মহাবিক্রমে অভ্যুত্থান করিলেন। পাকিস্তান-রাক্ষসের কবলে সমগ্র বঙ্গকে উৎসর্গ করিবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ ছিনাইয়া আনিয়া বাঙ্গালি হিন্দুর দাঁড়াইবার স্থান ও অস্তিত্ব রক্ষায় উপায় করিয়া দিলেন।''

> আপনি বামেদের সুযোগ্যা ছাত্রী ছিলেন এবং আছেন। তাই বলছি, বামেদের পরিণতিটা যে আপনারও হতে চলেছে। এখনো সময় রয়েছে। একবার জোর গলায় বলার চেষ্টা করুন দিদি। বলুন— ভারতমাতা কী জয়।

আচার্য প্রণবানন্দ তাঁর বাণীতে বলেছেন, 'আত্মবিস্মৃতি'-ই 'মহামৃত্যু'-ই 'মহামৃতু'। আচার্যদেব হিন্দু জাতিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, দুর্বলের বন্ধু কখনো দুর্বল হতে পারে না। তাই সত্যিই যদি সম্প্রীতি প্রয়োজন হয় সবলের পাশাপাশি নিজেদেরও সবল হতে হবে। একই কথা মনেপ্রাণে আজীবন বিশ্বাস করেছেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। গোটা দেশ তাঁর ডাকে সাড়া দিলেও দেরি করল তাঁর নিজের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। এবার ঘুম ভেঙেছে দিদি পশ্চিমবঙ্গের।

১৯৪৬ সালে সুরাবর্দিকে জবাব দিয়েছিল কলকাতা। এবার আপনাকে মানে লেডি সুরাবর্দিকে কলকাতা জবাব দিল।

মুসলিম লিগ কলকাতায় হেরে নোয়াখালিতে বদলা নিয়েছিল হিন্দু নিধন করে। এবারেও সেই চেষ্টা হতে পারে। বাংলাদেশের হিন্দুদের উপরে অত্যাচার হলে কিন্তু দিদি আপনার জামাত ভাইদের ছেড়ে কথা বলবে না পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাও।

আপনি ভালো থাকার চেষ্টা করুন। নিজের পদবি, নিজের গোত্রের কথা মাথায় রেখে বদলে যাওয়ার চেষ্টা করুন। গর্ব অনুভব করুন আপনার কলকাতা দক্ষিণের সেই সুপুত্রের কথা। জানি, পারবেন না। আপনি আবার পাকিস্তানের সমর্থনে গলা ফাটাবেন। আপনি বামেদের সুযোগ্যা ছাত্রী ছিলেন এবং আছেন। তাই বলছি, বামেদের পরিণতিটা যে আপনারও হতে চলেছে। এখনো সময় রয়েছে। একবার জোর গলায় বলার চেষ্টা করুন দিদি। বলুন— ভারতমাতা কী জয়। □

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে জেহাদি শক্তির রমরমা ঘুচে গেল

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে মানুষের মন থেকে ভয়ের পরিবেশ নির্মূল করতে হবে। এই সরকার যে তৃণমূল সরকারের থেকে পৃথক তা কাজে প্রমাণ দিতে হবে। তবেই জনগণের বিশ্বাস দীর্ঘ হবে।

আনন্দ মোহন দাস

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে জাগ্রত জনতার সেকু-মাকুরা তলিয়ে গেল। এটি একধরনের ভোটের সুনামি। এই প্রথম রাজ্যে একটি রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার পথে। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন সার্থক হলো। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আঞ্চলিকতাবাদী সরকারের মুখে রীতিমতো ঝামা ঘষে রাজ্যে প্রকৃত রাষ্ট্রবাদী সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত হলো। একসময় দেশের রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা অনেক উপহাস, হাসি-ঠাট্টা ও তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছেন। বিজেপি মানেই দাঙ্গাবাজ এই সমস্ত মিথ্যা ন্যারেটিভ সৃষ্টি করে জনমানসে এই দলটিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হতো। জনগণের রায়ের পর আজ বিজেপি-র বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করা দলগুলিকে, বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হার্মাদ বাহিনীকে দূরবীন দিয়ে দেখতে হয়। এতদিন হাতে থাকা একমাত্র রাজ্য কেরলমের শাসন ক্ষমতা থেকেও সে রাজ্যের জনগণ বামপন্থীদের হঠিয়ে দিয়েছে। সারা দেশে কোনো রাজ্যেই সিপিএম-এর শাসন নেই। কমিউনিস্টরা এখন গোটা দেশে নিশ্চিহ্ন হলো। বিগত ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট ও ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের এই কঙ্কালসার চেহারা তৈরির পিছনে মূল কারিগর সিপিএম। তাই উভয় দলই পশ্চিমবঙ্গের দুরবস্থা ও জঙ্গলরাজের জন্য দায়ী। জেহাদি তোষণ আর দেশাত্মবোধ ও হিন্দুত্বের বিরোধিতায় সিপিএম ও তৃণমূলের কোনো পার্থক্য নেই। নিত্যদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও বিজেপিকে গালাগালি না দিয়ে তাদের দিন কাটে না। এই নির্বাচনে উচিত শিক্ষা তারা পেয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামেরা এখন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। তাদের বিষয়ে আলোচনা না করাই ভালো। কিন্তু ইতিহাস মুছে যায় না।

এই ঐতিহাসিক জয় গোটা দেশের জন্যও একটি ইতিহাস রচনা করল। স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জনসঙ্ঘ, যে সংগঠনটি স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রবাদী রাজনীতির ধারা অব্যাহত রাখে। এই সংগঠনটি হতেই পরবর্তী পর্যায়ে জন্মগ্রহণ করে ভারতীয় জনতা পার্টি। এই প্রথম বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসীন হতে চলেছে। সারা দেশের মানুষের কাছে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল। বিগত ১৫ বছরের তৃণমূলের অত্যাচার, অপশাসন, ঔদ্ধত্য, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, জেহাদি দাপট, ব্যাপক দুর্নীতি, লুট, নারী নির্যাতন, শাসকদলের প্রশ্রয়ে দুষ্কৃতীদের দাপাদাপি, অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের দাপটে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তার প্রতিফলন ভোটবাক্সে নীরবে ঘটে গেছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেছে।

এবারের নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ করতে হলে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

২০২১-এ এরাজ্যে ৭৭টি বিধানসভা আসন পায় বিজেপি। এবার ২০৭টি আসন পেয়েছে। আসন বৃদ্ধির হার ১৬৮ শতাংশ। তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ২১৫ থেকে কমে গিয়ে ৮০-তে পৌঁছেছে। লজ্জাজনকভাবে তারা দুই অঙ্কে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। এই নির্বাচনে বিজেপি ভোট পেয়েছে ৪৫.৮৪ শতাংশ। বিজেপির ৬ শতাংশের ওপর ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে প্রায় ৪১ শতাংশ ভোট অর্থাৎ দল হিসেবে তাদের ৭ শতাংশ ভোট কমেছে। আইএসএফ-এর সঙ্গে বামেরা জোট করে পেয়েছে ৫.০৩ শতাংশ ভোট। কংগ্রেস ৩ শতাংশের মতো ভোট পেয়েছে। উভয়ের শূন্যের গেরো কেটেছে। বিধানসভায় আসন সংখ্যার নিরিখে তারা এবার খাতা খুলেছে।

(১) এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের মুসলমান তোষণের বিরুদ্ধে হিন্দুত্বের জাগরণ ঘটে গিয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গড়ে ৯৩ শতাংশ ভোটদান এই প্রথম। ২০১১ পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা প্রত্যেকবার প্রায় ৯৫ শতাংশের ওপর ভোট দিয়ে থাকে শাসক তৃণমূলের পক্ষে। সেক্ষেত্রে হিন্দুদের ভোট দানের হার থাকে ৬৩ শতাংশের মতো। পশ্চিমবঙ্গে সর্বোচ্চ ভোট দানের হার ছিল ৮৪ শতাংশ ২০১১ সালে। সুতরাং এই (৯৩-৮৪) ৯ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি মূলত হিন্দু ভোট। বেশিরভাগ দু'হাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন। বলাবাহুল্য এই হিন্দু জাগরণের পিছনে একদল রাষ্ট্রভক্ত মানুষের ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না, যা ইতিমধ্যে হিন্দি ও বাংলা নিউজ চ্যানেলগুলির বিশ্লেষণে প্রকাশ পেয়েছে।

(২) এসআইআর-এর ফলে এবার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস ভুয়ো, মৃত, ডুপ্লিকেট ও স্থানান্তরিত ভোটারদের অবৈধ ভোটকে অসাধু উপায়ে কাজে লাগাতে পারেনি। ২০২১ সালের অভিজ্ঞতার নিরিখে বিজেপি এবার সংগঠিতভাবে তৃণমূল ও আইপ্যাকের কারচুপি করার কৌশলগুলি ভোঁতা করেছে। সেটি ভোটদান ও ভোটগণনা উভয় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ির জন্য তৃণমূলি গুন্ডাবাহিনী ছাপ্পা ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়নি।

(৩) নির্বাচন কমিশন, ভোটকর্মী ও সুরক্ষাবলের দৃঢ় ভূমিকার ফলে অনেক দিন পর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে একটিও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। বাঙ্গালি এই বদনাম থেকে মুক্ত হলো বলে মনে হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় জনতা জনার্দন নির্ভয়ে ভোট দিতে পেরেছেন। পশ্চিমবঙ্গে এতদিন মানুষ ভোট দিতে ভয় পেতেন। এবার ভয়শূন্য ও অবাধ ভোট হয়েছে। এছাড়াও নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে মানুষ ভরসা রেখেছেন। অনেকেই বলেছেন, তৃণমূলের গুন্ডা ও লুম্পেনদের জন্য তাঁরা এতদিন ভোট দিতে পারেননি। এই সমস্ত জনরোষ বিজেপির পক্ষে গিয়েছে। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা সকলেই প্রশংসা করেছেন। এই কড়াকড়ির জন্য তৃণমূলনেত্রী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে 'ভ্যানিশ কুমার'-সহ বিভিন্ন অপমানজনক কথা বলে সাংবিধানিক সংস্থার বদনাম করেছেন। কারণ নির্বাচন কমিশন তার কুকর্মের সব পথ বন্ধ করে দেয়।

৪) এবারের নির্বাচনে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী-সহ ১৬ জন মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন। দুর্নীতিগ্রস্ত সবাইকে জনতা শিক্ষা দিয়েছে। এদের দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত জবাব জনগণ দিয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্তদের প্রার্থী করার শাস্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়ে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যেমন হেরেছেন তেমনি তার মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সতীর্থরাও হেরেছেন। যা বুঝিয়ে দিচ্ছে তৃণমূলের ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি নিয়ে এত বছর ধরে মানুষ কতটা ক্ষুব্ধ ছিল।

(৫) যারা বিজেপিকে অশিক্ষিত ও অসভ্যদের দল বলে কটাক্ষ করে থাকেন, তারা এবার ভালোরকম জবাব পেয়েছেন। কলকাতা ও কলকাতার দক্ষিণ ও উত্তর শহরতলির বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে শিক্ষিত মানুষ বিজেপিকে জিতিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রগুলি হলো— ভবানীপুর, রাসবিহারী, টালিগঞ্জ, যাদবপুর, জোড়াসাঁকো, মানিকতলা, শ্যামপুকুর, কাশীপুর-বেলগাছিয়া, বরাহনগর, দমদম প্রভৃতি। নির্বাচনী ফলাফল থেকে পরিষ্কার যে, উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলির মানুষ বিজেপিকে চাইছে। কলকাতার এলিট সম্প্রদায়ের বাস বিধাননগর, রাজারহাট-গোপালপুর, রাজারহাট- নিউটাউনের মতো এলাকাতেও বিজেপি ভালো মার্জিনে জয়লাভ করেছে। কারণ মানুষ অত্যাচারী শাসক তৃণমূলের বিকল্প হিসেবে বিজেপিকে বেছে নিয়েছে। রাজারহাট-গোপালপুরের মতো অনেক এলাকায় মুসলমান আধিক্য সত্ত্বেও হিন্দুরা একত্র হয়ে বিজেপিকে জিতিয়েছে।

(৬) এবারের নির্বাচনে বিশেষত্ব হলো রাজ্যের ৯টি জেলায় তৃণমূল খাতা খুলতে পারেনি। সেগুলি হলো— আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমান। কিন্তু বিজেপি সর্বত্র তার জয়ডঙ্কা বাজিয়েছে। এমন কোনো জেলা নেই যেখানে বিজেপি আসন পায়নি। এবারে উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে রাঢ়বঙ্গ ও জঙ্গলমহলে তপশিলি জাতি-উপজাতি, কুর্মী, মাহাতো সকলেই হিন্দু হিসেবে একসঙ্গে বিজেপির পাশে দাঁড়িয়েছে। হিন্দু বিভাজনের রাজনীতির অপচেষ্টা খতম হয়েছে। এই 'হিন্দু একত্রীকরণ' ভালো লক্ষণ। পূর্ব বর্ধমানে ২০২১ সালে তৃণমূল ১৬টি আসনেই জয়লাভ করেছিল। এবার সেখানে তারা মাত্র ২টি আসন পেয়েছে। বাকি ১৪টি আসনে বিজেপি জয়লাভ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শিল্পোন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে মানুষ আস্থা রেখেছেন। তাই এই সমস্ত জেলাগুলিতে তৃণমূল প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এছাড়াও হুগলী জেলায় হিন্দু ভোট একত্রিত হবার ফলে বিজেপির ফল খুব ভালো হয়েছে। জেলার ১৮টি আসনের মধ্যে ২০২১-এর নির্বাচনে তৃণমূল ১৪টি আসনে জয়ী হয়েছিল। এবারে তাদের মাত্র ২টি আসনে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে ১৬টি আসন।

(৭) রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় পরিযায়ী শ্রমিকরা বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত রয়েছেন, তাঁরাও ব্যাপক সংখ্যায় ভোট দিতে এসেছিলেন। তাদের বেশিরভাগ সরকার পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কারণ তাঁরা রাজ্যে পরিবারের সঙ্গে থেকে কর্মসংস্থান চায়। সেই দিশায় বিজেপির প্রচারে তারা আকৃষ্ট হয়েছে বলে ধারণা।

৮) এবারের নির্বাচনে সন্দেশখালি, আরজি কর, কসবা-র ভয়ংকর ঘটনা ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে মহিলারা ব্যাপকভাবে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। ১৫০০ টাকার ভাতা কাজে আসেনি। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েও নারী নিরাপত্তায় কোনো ব্যবস্থা নেননি বলে মহিলারা নিঃশব্দে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে।

(৯) শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি এবং নিয়োগ দুর্নীতির কারণে ২৬,০০০ শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়া দেশের ইতিহাসে প্রথম। অনেক যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষকদের চাকরি চলে গেছে এই অপদার্থ সরকারের কারণে। স্কুল-কলেজের পরিকাঠামো ও শিক্ষাব্যবস্থা পড়েছে। রাজ্য সরকার-পোষিত ৮,০০০ স্কুল— ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাইভেট বিদ্যালয়ের রমরমা বেড়েছে। ছাত্র রাজনীতির নামে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রাজনীতির আখড়া তৈরি হয়েছে। এই বেহাল শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগন পরিত্রাণ চেয়েছে।

(১০) সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও নানাভাবে সরকারি কর্মচারী, পেনশনারদের কেন্দ্রীয় হারে ডি.এ. প্রদান না করা ও সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর না করায় রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ ছিলেন। অনেকে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হয়েছেন। অনেকে রাত জেগে আন্দোলন ও অনশন করেছেন। কিন্তু এই নির্মম সরকার তাদের ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার করে দমনমূলক আচরণ করেছেন। তার জবাবে এই নির্বাচনে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে তাঁরা প্রতিকার চেয়েছেন।

(১১) এবারের নির্বাচনে আর একটি অন্যতম ইস্যু ছিল অবৈধ অনুপ্রবেশ। বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের নিরন্তর অনুপ্রবেশের

ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা ছাড়াও লাগামছাড়া অনুপ্রবেশের ফলে গোটা দেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়েছে। বেশ কিছু অঞ্চলে এদের সংখ্যাধিক্যের ফলে হিন্দুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। শাসকদল তৃণমূলের মদতে এদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। সিএএ, ওয়াকফ বিল-সহ বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলে আন্দোলনের পথ দেখিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। তার মুসলমান ভোটব্যাংকের রাজনীতির কারণে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। রাজ্য সরকার জেহাদিদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অনুপ্রবেশকারীদের চাপে রাজ্যের মানুষের রুটি রোজগারে ভাগ বসেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার্থে জনগণ সরকারের পরিবর্তন জরুরি বলে মনে করেছে। তাই তারা পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

(১২) এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় স্বাধীনতার পূর্ববর্তী পর্যায়ের পরিস্থিতি যেন ফিরে এসেছে। ১৯৪৭-এর ২০ জুন বঙ্গপ্রদেশের বিধানসভায় সংঘটিত ভোটে হিন্দু সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। মুসলমান সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গের বিপক্ষে ভোট দেয়। এবারও শাসক পক্ষের জয়ী বিধায়করা সবাই হিন্দু। প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে ৩২ জন মুসলমান। বাম-আইএসএফ জোটের জয়ী দুই বিধায়ক মুসলমান। কংগ্রেসের জয়ী দুই বিধায়ক হলো মুসলমান। 'বাবরি মসজিদ পার্টি'র নেতা হুমায়ুন কবির একাই দু'টি বিধানসভা আসনে জয়লাভ করেছে। সুতরাং, পশ্চিমবঙ্গ এই মুহূর্তে এক ঐক্যবদ্ধ ও সংহত জেহাদি শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে, যারা এযাবৎকাল কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই, খোলাখুলিভাবে পশ্চিমবঙ্গকে 'পশ্চিম বাংলাদেশ' বানানোর অভিপ্রায় ঘোষণা করেছে। এই জোটবদ্ধ হিন্দুবিরোধী ও ভারত-বিরোধী শক্তিগুলিকে পরাজিত করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত রাজ্য সরকারকে কাজ করতে হবে, রাজ্যবাসীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং আগামীদিনেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ৬ মে—এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ও বিধায়ক পদ থেকে তৃণমূলনেত্রী ইস্তফা দেননি। গত ৫ মে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি দাবি করেন যে, তিনি এই নির্বাচনে পরাজিত হননি। তাই ইস্তফা দেওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। স্বচ্ছভাবে ভোট দান ও ভোট গণনার পরও ১০০টি আসনের ফলাফলের বিষয়ে তিনি এদিন একাধিক অযৌক্তিক দাবি খাড়া করেন। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, ডেরেক ও'ব্রায়েন ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনে হেরে রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগপত্র জমা না করে সাংবিধানিক প্রথা ভেঙেছেন তৃণমূলনেত্রী। নির্বাচনে জয়-পরাজয় রয়েছে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয়ী বা পরাজিত হলে, প্রথা অনুযায়ী তিনি রাজ্যপালের কাছে ইস্তফা দান করেন এবং রাজ্যপালও তাঁকে একটি পত্র দ্বারা নতুন মন্ত্রীসভার শপথগ্রহণ এবং নতুন সরকার গঠন হওয়া পর্যন্ত 'প্রোটেম মুখ্যমন্ত্রী' বা 'কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী' হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন। ৭ মে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তৃণমূলনেত্রী ভারতীয় সংবিধানকে অবজ্ঞা এবং রাজ্যের জনমতকে অবমাননা করার কারণে নতুন মন্ত্রীসভার শপথগ্রহণের আগে সীমিত সময়ের জন্য এরাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জনমতকে অবমাননা করে চরম অগণতান্ত্রিক নজির সৃষ্টি করেছেন তৃণমূলনেত্রী। অবশ্য তিনি এই ধরনের অপকর্মে সিদ্ধহস্ত। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে রাষ্ট্রপতির বকলমে রাজ্যের শাসনভার সামলাবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আরএন রবি। ৯ মে কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রাজ্য মন্ত্রীসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার পোষিত হার্মাদ বাহিনীকে ৪ মে ভোটের ফল ঘোষণার পর বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ঘাড় আর মেরুদণ্ডটা ভেঙে দেওয়ার নিদান দিয়েছিলেন। ৪ তারিখের পর ইস্তফা না দিয়ে তৃণমূলনেত্রী রাজ্যে গণ্ডগোল পাকানোর ছক করছেন বলে অনেকে মনে করছেন। তার ইশারায় বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা বিজেপি-র কর্মী, সমর্থকদের ওপর আক্রমণ হানা শুরু করে দিয়েছে। তোলামূলি হার্মাদদের ভোট পরবর্তী হিংসায় উদয়নারায়ণপুরে একজন বিজেপি সমর্থক ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছেন।

এই জয়কে গত ১৫ বছরে তোলামূলি সন্ত্রাসে প্রাণ দেওয়া ৩০০ জন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন বুঝিয়ে দিয়েছে হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে পৃথিবীর কোনো শক্তি তাদের দমন করতে পারবে না। তবে এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতি ছাড়াও বিজেপি তাদের সংকল্প পত্রে রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও শিল্পের বিনিয়োগের পরিবেশ নির্মাণের কথা বলে বিকল্প রাস্তা দেখানোর ফলে জনগণ আকৃষ্ট হয়েছে। তবে বিগত ১৫ বছরের জঞ্জাল সাফ করে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হলেও কেন্দ্রীয় সহযোগিতা সর্বদা থাকবে এটাই জনগণের কাছে প্রধানমন্ত্রীজীর গ্যারান্টি। এটা রাজ্য সরকারের বড়ো পাওনা। দীর্ঘ ৪৯ বছর পরে রাজ্য ও কেন্দ্রে একই দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো, যার ফলে রাজ্যের উন্নয়নের রাস্তা খুলে গেল। এতদিন বিগত দুই দলের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বদা বিরোধিতা করে রাজ্যের উন্নয়নের যেমন রাস্তা বন্ধ করেছিল, তেমনি শিল্প-বান্ধব পরিবেশ নির্মাণেও ব্যর্থ হয়। নবনির্বাচিত সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। তাই বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল।

প্রথমেই রাজ্যের ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। শেখ শাজাহান, জাহাঙ্গির-সহ সকল জেহাদি শক্তির শাস্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে মানুষের মন থেকে ভয়ের পরিবেশ নির্মূল করতে হবে। এই সরকার যে তৃণমূল সরকারের থেকে পৃথক তা কাজে প্রমাণ দিতে হবে। তবেই জনগণের বিশ্বাস দীর্ঘ হবে। □

মাফিয়ারাজ অবসানের পর বঙ্গ সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠাই হলো সময়ের দাবি

এতদিন পশ্চিমবঙ্গ শুধু মুসলমান ঐক্য দেখেছে, মুসলমান ভোটব্যাংক দেখেছে, তাদের জোটবদ্ধভাবে ভোট দিতে দেখেছে। এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুর একতা দেখল, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন দেখল, হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট দিতে দেখল।

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

গত ৪ মে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন, ২০২৬-এর ফল প্রকাশ হয়েছে। এই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রথমবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এই নির্বাচন আর পাঁচটি রাজ্যের মতো সাধারণ একটি নির্বাচন ছিল না। এই নির্বাচন ছিল মহাভারতের কুরুক্ষেত্র ধর্মযুদ্ধের মতো। সেখানে যেমন একদিকে ছিল বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-সহ একশত কৌরব ভ্রাতা। এ যুদ্ধে তেমনি প্রবল হিন্দুবিরোধী জেহাদি সন্ত্রাসীতে পরিপূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের গুপ্ত সহচর সিপিএম কংগ্রেস-সহ আঞ্চলিক দলগুলি। আর বিপরীতে ছিল পঞ্চপাণ্ডবের মতো প্রায় সহযোগীহীন কিন্তু ধর্মে অটুট আস্থাশীল বিজেপি দল। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে বড়ো বড়ো রথী মহারথী না থাকলেও তার সঙ্গে যেমন ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ঠিক তেমনি বিজেপি একা হলেও তার সঙ্গে ছিল ধর্ম । সনাতনে অটুট আস্থা ছিল তার। সেজন্যে তার বিজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল।

বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে এই পশ্চিমবঙ্গ ছিল বিধর্মীদের দখলে। প্রথম ৩৫ বছর সিপিএম নামক এক হিন্দু বিদ্বেষী বামশক্তি এবং শেষ ১৫ বছর তৃণমূল কংগ্রেস নামক এক জেহাদি, সন্ত্রাসবাদী শক্তি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বাঁচা দুষ্কর করে তুলেছিল। ১৯৪৭ সালে মুসলমানরা ভারতবর্ষ ভেঙে অখণ্ড বঙ্গকে যখন ইসলামি দেশ বানাতে চেয়েছিল সেদিন ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দু বাঙ্গালিকে দিয়েছিলেন তার পরিচিতি। পাকিস্তানি হায়েনাদের মুখ থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে এনে বাঙ্গালি হিন্দুকে তার ভারতীয় পরিচয় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গত ৫০ বছরে বাম ও তৃণমূল শাসনে এই দু'টি রাজনৈতিক দল বাঙ্গালি হিন্দুর আবাসভূমি এই পশ্চিমবঙ্গকে জেহাদি বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করে তুলেছিল। শেষ ১৫ বছরের তৃণমূল শাসন এই পশ্চিমবঙ্গ যেন মুঘল শাসনে পর্যবসিত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের বাদশা ছিল হুমায়ুন, সন্দেশখালীর সুলতান ছিল শাজাহান, ফলতার নবাব ছিল জাহাঙ্গির, জলঙ্গীর শাসক ছিল বাবর, আর বাকি পশ্চিমবঙ্গকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হাজার হাজার অত্যাচারী ঔরঙ্গজেবদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আর দু'চারটি আকবরকে ছেড়ে রেখেছিলেন হিন্দুদেরকে সম্প্রীতির পাঠ শেখানোর জন্য। এদের দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে মুঘল শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। লক্ষ্য একটাই— তলে তলে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল বদলে দেওয়ার; ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তৈরি হিন্দু বাঙ্গালির হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম-বাংলাদেশে পরিণত করে সেখানে শরিয়তি শাসন প্রবর্তন করার। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত হিন্দু সমাজ আজ সেই বাম-তৃণমূলি চক্রান্ত ধরে ফেলেছে। তাই তারা সকলে এই নির্বাচনে বিজেপির ছত্রছায়ায় এসে এই ভয়ংকর জেহাদি শক্তিকে শুধু পরাজিতই করেনি, ধূলিসাৎ করেছে।

হিন্দু বাঙ্গালির বাসভূমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিন্দুত্বকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস কম চেষ্টা করেনি। জাতপাত নির্বিশেষে যে বাঙ্গালির কাছে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন পরমারাধ্য, যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছিল বঙ্গের ঘরে ঘরে চির-সমাদৃত, যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কুলদেবতা ছিলেন রঘুবীর শ্রীরাম, যে বাঙ্গালির মহাপুরুষের নাম রামমোহন, সাধকের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস— সেই শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি 'জয় শ্রীরাম'কে এই তৃণমূল গালাগালি বলে অভিহিত করেছিল। ২০২৬-এ তাদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে। তাই শ্রীরামের অপমানকারীরা শুধু পরাজিতই হয়নি, পশ্চিমবঙ্গের বুক থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

সনাতন ধর্মকে ছোটো করতে তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন— 'হিন্দু ধর্ম গন্দা ধর্ম'। তাদের নেত্রী মহুয়া মৈত্র বলেছিলেন— 'মা কালী আমার কাছে মদ মাংস খাওয়া দেবী', তাদের আরেক নেত্রী সায়নী ঘোষ শিবলিঙ্গে কন্ডোম পরিয়ে হিন্দুদের আরাধ্য দেবতা ভগবান শিবকে করেছিলেন চূড়ান্ত অপমান, আর তোলামূলিদের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা মদন

মিত্র বলেছিলেন— ভগবান রাম হিন্দু ছিলেন না, মুসলমান ছিলেন। এবারের নির্বাচন ছিল হিন্দুবিদ্বেষী এই তৃণমূলের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মযুদ্ধ। শুধু কি তাই? মমতা ব্যানার্জির শাসনকালে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সরকারি স্তরে যে চক্রান্ত হয়েছে, এই ফলাফল তাঁর বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান। হিন্দু পুরোহিতদের বঞ্চিত করে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের ভাতা দেওয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজের প্রতিবাদ।

এই ফলাফল স্কুলের হিন্দু ছাত্রীদের বঞ্চিত করে বেছে বেছে কেবল মুসলমান ছাত্রীদের 'ঐক্যশ্রী' স্কলারশিপ দেওয়ার মতো সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। এই ফলাফল ফিরহাদ হাকিমের মতো এক হিন্দুবিরোধী নেতাকে জোর করে তারকেশ্বর মন্দির জীর্ণোদ্ধার কমিটির সভাপতি করে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই ফলাফল ফিরহাদ হাকিম হিন্দুদের দুর্ভাগা বলে অভিহিত করার, হিন্দুদের দাওয়াতে ইসলাম দিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই ফলাফল কলকাতাকে মিনি পাকিস্তান বলে অভিহিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই ফলাফল মুখ্যমন্ত্রীর আদরের হুমায়ুনকে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে অত্যাচারী বাবরের নামে বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য উসকানি দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই ফলাফল মুখ্যমন্ত্রীর একটি কমিউনিটিকে দিয়ে হিন্দুদের মানুষকে এক সেকেন্ডে মেরে ফেলবার হুমকি দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

এই ফলাফল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুলমান ও রোহিঙ্গাদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটাধিকার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম-বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে জাগ্রত হিন্দুশক্তির জাগরণ। এই জয় আরজি করের ডাক্তারি ছাত্রী অভয়া-সহ পশ্চিমবঙ্গের শত শত নির্যাতিতা বোনের আর্তচিৎকারের বহিঃপ্রকাশ। এই ফলাফল বিগত কয়েক দশকে হিন্দু বাঙ্গালির হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গকে জেহাদি মোল্লাবাদীদের হাতে তুলে দেওয়ার তৃণমূলি চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জনরোষ, পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে--- দেগঙ্গা, খাগড়াগড়, ক্যানিং, উস্তি, ডায়মন্ড হারবার, ধুলাগড়, বসিরহাট, বাদুড়িয়া, কালিয়াচক, সামশেরগঞ্জ, সমুদ্রগড়, তেলেনিপাড়া, মহেশতলা, শ্যামপুরের অসংখ্য হিন্দুর ওপর জেহাদি আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হিন্দুর আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ।

হিন্দুত্বের এই জাগরণ সহজে আসেনি। ১৯৩৯ সাল থেকে ২০২৬— দীর্ঘ ৮৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের এই মাটিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে হিন্দুত্বের সাধনা করে গেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং তার সহযোগী সংগঠনগুলি। তার ফলিত রূপ আজ এই নির্বাচনের ফলাফল। এবারের নির্বাচন কোনো দু'টি রাজনৈতিক দলের লড়াই ছিল না। এবারের নির্বাচন ছিল না শুধুমাত্র বিজেপি নামক একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস নামক আরেকটি রাজনৈতিক দলের লড়াই। এ ছিল ধর্মযুদ্ধ— ধর্মের সঙ্গে অধর্মের, হিন্দুদের সঙ্গে জেহাদি ও মোল্লাবাদীদের। সে লড়াইতে ১৯৮৪ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রাণ দিয়েছেন স্বয়ংসেবক প্রশান্ত মণ্ডল। হিন্দুদের বিজয় পতাকা রক্ষায় ব্রতী হয়ে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর হাতে তিনি নিহত হয়েছেন। সেই লড়াইতে ২০০১ সালে বীরের মতো যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছেন বাসন্তীর অভিজিৎ, পতিত, অনাদি, সুজিতরা। সেই লড়াইতে অংশগ্রহণ করে ২০১৮ সালে পুরুলিয়ার বলরামপুরের ত্রিলোচন মাহাতো থেকে শুরু করে ২০২১ সালে বেলেঘাটার অভিজিৎ সরকারের আত্মাহুতির কথা স্বর্ণাক্ষরে সাম্প্রতিক ইতিহাসে লেখা রয়েছে। বাঙ্গালি হিন্দু আজও তাঁদের ভোলেনি। আজকের বিজেপির এই বিজয় সেই বীর হুতাত্মাদের প্রতি বাঙ্গালি জাতির সশ্রদ্ধ প্রণাম।

এত বছরের বাঙ্গালির সাধনা আজ সিদ্ধিলাভ হতে চলেছে। সন্দেশখালিতে অত্যাচারিত মা-বোনেরা আজ জেগে উঠেছেন। ডায়মন্ড হারবারের স্বঘোষিত যুবরাজের অত্যাচারের শেকল ছিঁড়ে ফলতার মা-বোনেরা পথে নেমেছে, প্রতিরোধে নেমেছে অত্যাচারী জেহাদি জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে। এ হলো এত বছর ধরে হিন্দুত্বের সাধনার ফল। 'বাঙ্গালি হিন্দু কোনোদিন এক হতে পারে না'— এই মিথ ভেঙে দিয়েছে বাঙ্গালির ঘরের শাঁখা-সিঁদুর আলতা পরা মা-বোনেরা। 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে, এক রহেঙ্গে তো সেফ রহেঙ্গে'— যোগী-মন্ত্রের নিঃশব্দ বিপ্লব হয়েছে ইভিএম মেশিনে। এই মন্ত্রেই অঙ্গ ও কলিঙ্গের পর বঙ্গেও আজ নিনাদিত হচ্ছে হিন্দুত্বের উদ্ঘোষ। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের শাসনের শেষে ৮২০ বছর পর খণ্ডিত বঙ্গে আবার হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাটিতে তাঁর মতাদর্শে পরিচালিত রাজ্য সরকার গঠিত হচ্ছে। যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ একদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিজের গলার মালাটি পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন 'শ্যামাপ্রসাদই ভবিষ্যতে বাঙ্গালি হিন্দুর নেতা'। আজ সেই ঋষিবাণী সার্থক। বাঙ্গালি হিন্দু হৃদয় সম্রাট শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসঙ্ঘের রাজনৈতিক উত্তরসূরী ভারতীয় জনতা পার্টি আজ বাঙ্গালির ভোটে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত।

এতদিন পশ্চিমবঙ্গ শুধু মুসলমান ঐক্য দেখেছে, মুসলমান ভোটব্যাংক দেখেছে, তাদের জোটবদ্ধভাবে ভোট দিতে দেখেছে। এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুর একতা দেখল, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন দেখল, হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট দিতে দেখল। বিজেপি ছাড়া অন্য সব রাজনৈতিক দল এতদিন ৩০ শতাংশ দুধেল গাইয়ের লাথি খেতে পছন্দ করত। এই প্রথম বাঙ্গালি দেখল ৭০ শতাংশ এক হতে জানে। তারা এক হয়ে ইতিহাস তৈরি করতে পারে।

তৃণমূল কংগ্রেস ভুলে গিয়েছিল কংসের কারাগারে মহামায়া দুর্গার সেই আকাশবাণী— 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'। কামদুনির সেই নির্যাতিতা কন্যাটি বা আরজি করের অত্যাচারিতা ডাক্তারি ছাত্রী অভয়া— সেই আকাশবাণী শুনিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। কিন্তু অত্যাচারী, দুরাচারী সরকার কংসের মতো ক্ষমতার দম্ভে সেই আকাশবাণী শুনতে পাননি। সেই শত শত নির্ভয়াদের অভিশাপ আর চোখের জলই আজ ধ্বংস করে দিল অত্যাচারীর সাম্রাজ্যকে। জয় পশ্চিমবঙ্গ, জয় ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ। □

ম্যান অফ দ্য সিরিজ নির্বাচন কমিশন

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতেই পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া ঝড়

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে প্রথম নির্বাচন সংঘটিত হয়েছিল ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে বাঙ্গালি নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেন (আইসিএস)-এর তত্ত্বাবধানে। পরবর্তী সময়ে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে কিংবা পৃথকভাবে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন সন্ত্রাস, কারচুপি, ভোটলুট ও রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে সংঘটিত হয়েছে। শ্বেত সন্ত্রাস, লাল সন্ত্রাস ও সবুজ সন্ত্রাস অতিক্রম করে ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে নজিরবিহীন ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে একথা নিন্দুকও বলতে কুণ্ঠা করছেন না!

১৫৫ দিনের বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর)-এর পর ৭ কোটি ৬০ লক্ষ ভোটার থেকে প্রায় ১২ শতাংশ অর্থাৎ ৯০ লক্ষ ৬০ হাজার নাম বাদ যাওয়ার পর ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোটার ৯০.৬ লক্ষ কমা সত্ত্বেও প্রথম পর্যায়ে আগের তুলনায় ভোটদান বেড়েছে ২১ লক্ষ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আগের তুলনায় ভোটদান বেড়েছে ১০ লক্ষ। ভোটের প্রথম পর্যায়ে ১৬টি জেলার ১৫২টি কেন্দ্রে পুরুষ ১.৮৪ কোটি, মহিলা ১.৭৬ কোটি এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৪৬৫ জন মিলিয়ে ৯৩.১৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮টি জেলায় ১৪২টি কেন্দ্রে পুরুষ ১.৬৫ কোটি, মহিলা ১.৫৭ কোটি এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৭৯২ জন মিলিয়ে ৯১.৬৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। (নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য)

নজিরবিহীন ভোট দানের হার সরকার বদলের ইঙ্গিত দেয়। ১৯৭৭ সালের পালা বদলে পশ্চিমবঙ্গে ভোট পড়েছিল ৫৬.২ শতাংশ, ২০১১-য় অলীক পরিবর্তনে ভোট পড়েছিল ৮৪ শতাংশ এবং ২০২৬-এ প্রকৃত পরিবর্তনের আশায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট দানের হার সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে দাঁড়িয়েছে ৯২.৪৭ শতাংশ। ২০২১ শাসক দলের সঙ্গে প্রধান বিরোধী দলের ভোটের পার্থক্য ছিল ৪২ লক্ষ, অথচ নাম বাদ ৯১ লক্ষ এবং ভোটদান বৃদ্ধি ৩১ লক্ষ। সততার নামে সীমাহীন দুর্নীতি, প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ অর্থের বিনিময়ে সংঘটিত হয়েছে। শিক্ষাকর্মী নিয়োগে দুর্নীতি, পৌরসভায় কর্মী নিয়োগে দুর্নীতি, WBCS পরীক্ষায় ফেল করে প্রথম হওয়া এই রাজ্যেই সম্ভব হয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক থেকে উপাচার্য নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব প্রতীয়মান। শিক্ষার অবনমন, স্বাস্থ্যের বেহাল দশা, সরকারি কর্মচারী নিয়োগে শ্লথভাব, শিল্পের রাজ্য ত্যাগ, বিনিয়োগের সেই অলীক কল্পনায় ভর করে পাখা মেলেছে।

খাদ্য উৎপাদনে অগ্রণী রাজ্য ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে। নদী-নালা শস্যশ্যামলা পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু আয়ে রাজ্যের মধ্যে ২১তম স্থান অধিকার করেছে। কয়লা, বালি, পাথর মাফিয়ারা পশ্চিমবঙ্গে সমান্তরাল অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে। MSME-তে অন্যান্য রাজ্যে নগ্ন MSME ইউনিটের সংখ্যা

ক্রমবর্ধমান। স্বাধীনতার পরও বিহার, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্রমিকরা এই রাজ্যে আসতো, আজ পরিযায়ী শ্রমিকের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গে এক নম্বরে। 'ম্যাকনামারা গোব্যাক' কিংবা রাইটার্সের সামনে আদিত্য বিড়লার হেনস্থার মধ্যে দিয়ে বামেদের শিল্পবিমুখতার ছবি যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি সিঙ্গুর থেকে টাটাকে সানন্দে বিদায় করে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সম্ভব হলেও বিনিয়োগ যেমন পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুখ ফিরিয়েছে, তেমনি, ৬,৫০০ বড়ো ও মাঝারি শিল্প ২০১১-র পর এরাজ্য থেকে অন্যরাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের শূন্যপদে নিয়োগ যেমন হয়নি, তেমনি কেন্দ্রীয় হারের থেকে ৪২ শতাংশ কম ডিএ পাওয়ার ফলে সরকারি কর্মচারীদের জীবনযাত্রায় সংকট দেখা দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও পঞ্চম বেতন কমিশনের বকেয়া ডিএ দিতে অনিহা এবং সর্বশেষ ৪ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করে না দেওয়ার ফলে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষোভকে তীব্র থেকে তীব্রতর করেছে। অযোগ্যরা ক্লাসরুমে আর যোগ্য ছাত্র-যুব রাস্তায় বছরের পর বছর ধরনায় বসাকে মানুষ ভালো ভাবে নেয়নি। নারী সুরক্ষার নিরিখে রাজ্য তথ্য লুকোতে তৎপর। আরজি করে ডাঃ অভয়ার সর্বোচ্চ লাঞ্ছনা ও হত্যা, সাউথ কলকাতা ল' কলেজের ইউনিয়ন রুমে ছাত্রীর চূড়ান্ত সম্ভ্রমহানি, কামদুনি, সন্দেশখালি, কত বলব— এ লজ্জা আমরা রাখবো কোথায়! বিশেষ সম্প্রদায়কে কাজে লাগিয়ে লাভ জেহাদ। জনবিন্যাসের দ্রুত পরিবর্তনে ড. শ্যামাপ্রসাদের 'হিন্দু হোমল্যান্ডে' পশ্চিমবঙ্গ আজ যেতে চলেছিল। ২০২১-এ শীতলকুচিতে গুলি চালানোর পরিস্থিতি থেকে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-তে ও ভারতীয় মুসলমানদের চিন্তার ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে।

কফিনের শেষ পেরেক পোতা হয়েছে ১০ এপ্রিল, ২০২৬ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষ্যে 'ভরসার শপথ' প্রকাশের মধ্য দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে প্রতিমাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা, কর্মসংস্থানের সন্ধানে থাকা যুবক-যুবতীদের প্রতিমাসে ৩,০০০ টাকা করে

অনেক অমানিশা অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গ আজ সূর্যোদয়ের মুখ দেখেছে। মানুষের প্রত্যাশা ও নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিকে মান্যতা দিয়ে 'সোনার পশ্চিমবঙ্গ' গড়ার লক্ষ্যে তণ-ধন-মন নিবেদন করতে হবে তবেই পশ্চিমবঙ্গের রাহুমুক্তি ঘটবে!

আর্থিক সহায়তা, মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ, সরকারি কর্মচারী ও পেনশন ভোগীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা নিশ্চিত করা এবং সপ্তম বেতন কমিশন বাস্তবায়ন করা এবং জাতীয় সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি মানুষের মনে আস্থার সঞ্চার করেছে। ভোট পরবর্তী সমীক্ষায় অলীক পরিবর্তনের পরিবর্তে প্রকৃত পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

১৫ বছরের দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ পদ্মাসনে অধিষ্ঠিত হলো। গৈরিক ঝড়ে মমতার ভ্রষ্টাচারী দানবীয় শক্তির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বিজেপি বাঙ্গালির 'হিন্দু হোমল্যান্ড' পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়েছে। লাল-সবুজের পর পশ্চিমবঙ্গের রং বদলে হলো গেরুয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যথার্থই বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে। বিজেপির জয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মা শান্তি পাবে। তিনি উন্নত পশ্চিবঙ্গের স্বপ্ন দেখেছেন। তা বহু বছর ধরে অপূর্ণ ছিল। বিজেপি-কে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একটি সুযোগ দিয়েছেন।'

গৈরিক ঝড়ে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শুধু ক্ষমতায় আসেনি, নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় এসেছে অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষায়, 'আজ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে নতুন সুর্যোদয় হয়েছে, বহু প্রজন্মের অপেক্ষার অবসান। এবার পশ্চিমবঙ্গে বদলা নয়, বদল হবে।'

বিজেপি যেমন ২০৭টি আসন পেয়েছে তেমনি ৭.৮৪ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫.৮৪ শতাংশ। অন্যদিকে প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূলের ভোট শতাংশ ৪৮ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪০.৮০ শতাংশ। তেমনি বিজেপির প্রাপ্ত আসন ৭৭ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০৭। অন্যদিকে তৃণমূলের আসন ২১৫ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৮০। বাম-কংগ্রেস খাতা খোলার আনন্দে মশগুল। ৯টি জেলায় শাসকদল খাতা খুলতে পারেনি।

বিজেপির কাছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশা শিক্ষাক্ষেত্রের গৌরবময় অধ্যায় ফিরিয়ে আনা। স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক-সহ সমস্ত প্রকার নিয়োগ করা। আপৎকালীন ত্রাণ থেকে মানুষ পরিত্রাণ চেয়েছে। ১৯৪৭ সালের রাজ্যের জিডিপি ২৫ শতাংশ থেকে কমে ১৯৭৭ সালে দাঁড়িয়েছে ১৩ শতাংশ। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের জিডিপি কমে দাঁড়ায় ৬—৬.৭ শতাংশ। ২০২৬ কমে দাঁড়ায় ৫.৬ শতাংশে। যেখানে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৬-৭ শতাংশ, সেখানে ২০১২—২০২৪ পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধির হার ৪.৩ শতাংশ থেকে ৪.৫৯ শতাংশ থেকেছে। বিজেপির ভরসার শপথ অনুসারে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবার পুনর্বাসন নতুন সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য। অর্থনীতিতে গতি সংস্কার করতে পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজনীয়। প্রতিশ্রুতি অনুসারে সুন্দরবন থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত জাতীয় সড়ক দ্রুত নির্মাণের কাজ হাতে নিতে হবে। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন মানুষের প্রত্যাশা। শাসকের আইন নয়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এই সরকারের মূল লক্ষ্য।

মনে রাখতে হবে, শোক কিংবা সুখের পরমায়ু ক্ষণস্থায়ী। অনেক অমানিশা অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গ আজ সূর্যোদয়ের মুখ দেখেছে। মানুষের প্রত্যাশা ও নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিকে মান্যতা দিয়ে 'সোনার পশ্চিমবঙ্গ' গড়ার লক্ষ্যে তণ-ধন-মন নিবেদন করতে হবে তবেই পশ্চিমবঙ্গের রাহুমুক্তি ঘটবে! □

বঙ্গ রাজনীতির অঙ্গ পরিবর্তন

তমসো মা জ্যোতির্গময়

অম্লান কুসুম ঘোষ

গত ৪ মে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো বঙ্গবাসী। আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি সবুজ ধানখেতে, প্রতিটি নদ-নদীর জলস্রোত, প্রতিটি কলকারখানার আনাচেকানাচে, প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর কাগজে কলমে, প্রতিটি মানুষের চোখে-মুখে আজ বড়ো তৃপ্তির হাওয়া ও বড়ো আনন্দের ঝিলিক। আজ বড়ো আনন্দের দিন, কারণ আজকে মুক্তির দিন। মুক্তি দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ দশকের একের পর এক পৈশাচিক শাসনব্যবস্থার হাত থেকে।

এ মুক্তি বড়ো সহজ ছিল না। গণতন্ত্রে নির্বাচন মানুষকে আগামী শাসনব্যবস্থা চয়ন করার সুযোগ দেয় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনী ব্যবস্থাও এতদিন ছিল ত্রুটিপূর্ণ। পার্টি পোষিত মস্তানদের নির্মম অত্যাচারে, কখনো সাইন্টিফিক রিগিং, কখনো চড়াম চড়াম আর গুড়-বাতাসার ভয়ে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ব্যবস্থাও হয়ে পড়েছিল কলুষিত। সাধারণ মানুষ সেই নির্বাচন ব্যবস্থার ধারে কাছে আসারও সুযোগ পেতেন না। ভোট আসতো, ভোট যেত, কিন্তু ইভিএমের বোতাম টেপার সুযোগ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরেই থেকে যেত চড়াম চড়াম শব্দের ভয়ে। এবারে নির্বাচন কমিশন পরিচালিত এই নির্বাচন হয়েছে প্রকৃতই শান্তিপূর্ণ। দীর্ঘদিন পরে এবারের নির্বাচনে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি, ফলে সাধারণ মানুষ ভোট দিয়েছে নির্ভয়ে। সেকারণেই এবার রেকর্ড ভাঙ্গা ভোট পড়ে এবং সেই ভোট পড়ে সঠিক দিকেই। সাধারণ মানুষ এবারেই প্রথম ভোট দিয়েছেন মন খুলে আর সেই ভোটের ফলাফলেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে দুশোর বেশি আসন জিতে এবারে ক্ষমতা দখল করল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং দুই অঙ্কে স্থির হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তরের দার্জিলিং, কালিম্পঙের পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত বিধানসভা কেন্দ্র থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগরের সমুদ্র তীরবর্তী বিধানসভা কেন্দ্র পর্যন্ত, পূর্বের নদীয়া জেলা ও বনগাঁ এলাকার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে শুরু করে পশ্চিমে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার বিধানসভা পর্যন্ত সর্বত্রই বিজেপি জয়ী, তৃণমূল পর্যুদস্ত পরাজিত। বিজেপির বিপুল বিজয় আজ সর্বত্র স্বীকৃত। পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত অর্থেই পরিবর্তন এল।

এ পরিবর্তন বড়ো সহজে আসেনি, অপেক্ষা করতে হয়েছে দশকের পর দশক। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসী সহ্য করেছে ক্রমগত একের পর এক সরকারের অত্যাচার। প্রথমে সত্তরের দশকে ইন্দিরা কংগ্রেসের সেই পৈশাচিক অত্যাচার, জরুরি অবস্থার বিভীষিকা। তারপর কমিউনিস্টদের অভিশপ্ত ৩৫ বছরের অভিশাপ। নির্মম অত্যাচার, গণহত্যা, ব্যক্তিহত্যা, ধর্ষণ ও দুর্নীতির লাগাম ছাড়া নির্মমতা পশ্চিমবঙ্গের কপালে লেপে দিয়েছিল কলঙ্কের কালিমা আর মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছিল চিরস্থায়ী দুঃস্বপ্ন হিসেবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিত্রাণ চেয়েছিল কিন্তু পরিত্রাণ চাইতে গিয়ে ২০১১ সালে সিপিএমের তপ্ত কড়াই থেকে গিয়ে পড়েছিল জ্বলন্ত উনুনরূপী তৃণমূলের কবলে। তারপরে অপেক্ষা আরও ১৫ বছরের। এই ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেছে সিপিএমের আমলের মতোই অত্যাচার ও অবিচারের বিভীষিকা। মানুষ আবারও চেয়েছে পরিত্রাণ। এবারের পরিত্রাণ চেয়েছে সঠিক পথে। পথ ভোলা পথিকের মতো এবার আর পথ ভুল করেনি। বেছে নিয়েছে সঠিক পথ। তথাকথিত সমাজবাদের অন্ধ কানাগলি নয় বরং জাতীয়তাবোধের প্রশস্ত রাজপথকেই নিয়েছে বরণ করে। স্বাধীনতার এত বছর পরে এবারেই বেছে নিয়েছে সঠিক পথকে। এবার থেকে শুরু হবে উন্নতির দিকে পশ্চিমবঙ্গের পথ চলা, অন্ধকার দিক থেকে আলোর দিকে পথ চলা, ৩৫ বছরের কমিউনিস্ট এবং ১৫ বছরের তৃণমূলের মিলিত ৫০ বছরের সৃষ্ট ঘোর অন্ধকারকে দূর করে আলোর দিকে পথ চলা।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমলে পশ্চিমবঙ্গ যেমন শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের ১ নম্বর স্থানে ছিল সেইরকম পুনরায় শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত করে তোলা এবং শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এটাই হোক সরকারের প্রথম লক্ষ্য।

এই মুক্তির দিনটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে বহুকাল। এই 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে'। কত রাষ্ট্রভক্ত নাগরিকের জীবন যৌবন সমর্পিত হয়েছে এই দিনটি দেখার জন্য। তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়েছেন স্বর্গগত। যাঁরা স্বর্গগত তাঁরা স্বর্গ থেকেই হয়তো প্রত্যক্ষ করছেন এই দিনটিকে। স্বর্গ থেকেই এই দিনটির দিকে হয়তো তাকিয়ে রয়েছেন ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সঙ্ঘের সেই অগণিত স্বয়ংসেবক, বিগত সাতদশক ধরে যাঁরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এই দিনটি দেখার জন্য। আর অপেক্ষাকৃত নতুন

প্রজন্মের যাঁরা ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট চোখে দেখেনি, সেই প্রজন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের আনন্দ উপলব্ধি করেছে গত ৪ মে দাঁড়িয়ে।

বিজয় এসেছে, পরাজিত হয়েছে দেশবিরোধী শক্তি। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার আজ দেশভক্ত, জাতীয়তাবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। এবার কিন্তু শুরু হলো প্রকৃত পরীক্ষা— এ পরীক্ষা সুষ্ঠু প্রশাসন আর উন্নত পরিকাঠামো দেওয়ার পরীক্ষা, এ পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গকে আবার ভারত সেরা করার পরীক্ষা; এ পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ দুর্নীতি মুক্ত করার পরীক্ষা; এ পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমলের মতো গর্বের শীর্ষ শিখরে নিয়ে যাওয়ার পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য রাষ্ট্রভক্ত প্রত্যেক নাগরিককে, রাষ্ট্রের জন্য নিবেদিতপ্রাণ সকল স্বয়ংসেবককে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে হবে। বঙ্গবাসীর যে বড়ো আশা এখন এই নতুন জাতীয়তাবাদী সরকারকে নিয়ে। বড়ো আশা ভরা চোখ নিয়ে এই সরকারের দিকে তাকিয়ে আছে সেই উচ্চশিক্ষিত যুবকের দল যারা তাদের শিক্ষা উপযোগী চাকরি নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, তাকিয়ে রয়েছে সেইসব উপোসী শ্রমিকের দল যারা চায় তাদের বন্ধ কারখানাটি আবার খুলুক তিন দশক পরে, তাকিয়ে রয়েছে সেই শান্তি প্রিয় নাগরিকেরা যারা চায় তাদের পাড়ায় দুষ্কৃতীদের মস্তানি বন্ধ হয়ে একটু শান্তি ফিরে আসুক, তাকিয়ে আছে সেই অভাবী কৃষকের দল যারা চায় এরা যে রাজ্যে কৃষিনির্ভর শিল্প স্থাপিত হয়ে তাদের উৎপাদিত ফসলের একটু বেশি মূল্য যেন তারা পায়, তাকিয়ে রয়েছে সেই ছাত্র সমাজ যারা চায় এক উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, তাকিয়ে রয়েছে সেই শিক্ষক সমাজ যারা চায় শিক্ষাঙ্গনে শান্তির পরিবেশ, তাকিয়ে রয়েছে সেই ভবিষ্যতের উদ্যমী যে চায় এই রাজ্যে শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত শিল্পবান্ধব পরিবেশ, তাকিয়ে রয়েছে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সেই সমস্ত মানুষেরা— নিত্য অনুপ্রবেশ যাদের রাতের ঘুম কেড়েছে চিরতরে, সর্বোপরি তাকিয়ে আছে সেই সব অত্যাচারিত

বিগত পাঁচ দশকে যে বিপুল দুর্নীতির পাহাড় গোটা রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিয়েছে সেই দুর্নীতিগুলির প্রত্যেকটির তদন্ত করতে হবে এবং দোষীদের আইন অনুসারে শাস্তি দিতে হবে।

মানুষেরা ৫ দশক ধরে অত্যাচারিত হয়ে যারা চায় শুধুমাত্র ন্যায়বিচার।

এই সমস্ত আশা ভরা চোখগুলির আশাগুলিকে পূর্ণ করতে হবে এবং সেই আশা পূর্ণ করার দায়িত্ব রয়েছে এই নবগঠিত জাতীয়তাবাদী সরকারের স্কন্ধে। তাই বলি এখন অনেক বড়ো পরীক্ষা, অনেক বহুধা বিস্তৃত কাজ। এই রাজ্যকে শিল্পে তার পূর্ব গৌরব অর্জন করাতে হবে। দেশের মোট শিল্প উৎপাদনের অন্তত ২৫ শতাংশ যেন এই রাজ্য থেকেই হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এ রাজ্যের চির অবহেলিত পরিষেবা ক্ষেত্র যেন সঠিকভাবে বিকশিত হয় এবং অন্নপূর্ণার আপন দেশে অন্নদাসুতকে যেন আর ভিক্ষে না চাইতে হয় সে ব্যবস্থাও করতে হবে। বিগত পাঁচ দশকে যে বিপুল দুর্নীতির পাহাড় গোটা রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিয়েছে সেই দুর্নীতিগুলিরও প্রত্যেকটির তদন্ত করতে হবে। বিগত ছয় দশক ধরে রাজ্যে যতগুলি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেগুলিরও তদন্ত করা দরকার বিশেষ করে ২০২১ সালের পর বিজেপি কর্মীদের উপর যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এবং ১৯৭৮ সালে মরিচঝাঁপিতে আর ১৯৮৩ সালে বিজন সেতুতে যে গণহত্যা ঘটেছিল এসবগুলিরই তদন্ত করা দরকার।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমলে পশ্চিমবঙ্গ যেমন শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের ১ নম্বর স্থানে ছিল সেইরকম পুনরায় শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত করে তোলা এবং শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এটাই হোক সরকারের প্রথম লক্ষ্য। এছাড়াও রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নত করা এবং প্রচুর কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে বেকারত্বকে সমূলে উচ্ছেদ করা এগুলিও আগামী সরকারের প্রাথমিক কাজগুলির মধ্যে অন্যতম। দীর্ঘদিন বাম এবং পরবর্তী পর্যায়ে অতিবামমনস্ক তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অধীনে থাকা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ও মনন থেকে বিদেশি সংস্কৃতিকে উপড়ে ফেলে স্বদেশি সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা— এটাই কিন্তু হবে আগামী সরকারের সর্বোপরি দায়িত্ব। মার্ক্স, লেনিন, স্তালিন, মাও, ভিক্টোরিয়া, সুরাবর্দি ইত্যাদি বিদেশিদের নামে রাজ্যে যত রাস্তা,পার্ক, মূর্তি আছে সেগুলি উপড়ে ফেলে, নাম পরিবর্তন করে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শিক্ষাবিদদের নামে সেগুলির নামকরণ করাও প্রয়োজন। দেশের সুরক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ পূর্ব সীমান্ত ব্যাপী মুসলমান অনুপ্রবেশকে চিরতরে বন্ধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের আগামী জাতীয়তাবাদী সরকারের বদ্ধপরিকর হওয়া প্রয়োজন।

এ সময়টা কিন্তু বড়ো সচেতনতারও সময়। সরকার পরিবর্তনের সময় সাফল্যের জোয়ারের তলদেশ দিয়ে অনেক সুযোগসন্ধানী ভিন্নদলীয় বেনো জলেরও প্রবেশ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। সেই বেনোজলের হাত থেকে রক্ষা করে নতুন সরকারের নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত প্রকৃত আদর্শনিষ্ঠ সৎ ও পরীক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হাতেই।

আশাভরা চোখ গুলিকে আশাতৃপ্ত করে এই নবনির্বাচিত রাজ্য সরকার একটি সৎ প্রশাসন যদি উপহার দিতে পারে তবে রাজ্যবাসীর চোখে নতুন সরকার ভগবৎ তুল্য মর্যাদা পাবে এবং আগামী শতবর্ষ এই সরকারই বঙ্গ রাজনীতিকে শাসন করবে। আর যদি না করতে পারে, যদি বহিরাগত বেনোজল কোনোভাবে এই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে, তাহলে কিন্তু মানুষ ভরসা হারিয়ে ফেলবে। তাই সাবধানতা প্রয়োজন। □

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে জনমতের বিস্ফোরণ

বাঙ্গালি হিন্দুর স্বাধীনতার অনুভূতি

সাধন কুমার পাল

গত ৪ মে সকালে গণনা শুরু হতেই বোঝা যাচ্ছিল সঙ্ঘের শতবর্ষে বাঙ্গালি হিন্দুরা ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের পশ্চিমবঙ্গ গড়তে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ঢেলে ভোট দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের সমস্ত বিশ্লেষণকে ভুল প্রমাণিত করে ২০৭টি আসনে জয়ী হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হয়েছে। এই দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গের আরেকটি স্বাধীনতা দিবস চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ বাঙ্গালি হিন্দু নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য এর আগে কখনো এরকম সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেরকম নজির আর নেই। তবে একসময় সমগ্র বঙ্গকে নিয়ে যে কথাটি বলা হতো এখন গোটা রাজ্যের সাপেক্ষে উত্তরবঙ্গকে নিয়ে সেই কথা বলা যায়— হোয়াট উত্তরবঙ্গ থিঙ্কস্ টুডে পশ্চিমবঙ্গ থিঙ্কস্ টুমরো। কারণ ২০১৯ সাল থেকেই উত্তরবঙ্গের হিন্দুরা নিজেদের জাতপাত, মতপার্থক্য ভুলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জিতিয়ে আগামীদিনের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দিশা তৈরি করে দিয়েছে।

এবারও উত্তরবঙ্গ ৫৪টির মধ্যে ৩৯টি আসন জিতে সেই ধারা বজায় রেখেছে। গত ২৩ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রথম দফার ভোট শেষে সর্বত্রই চর্চা— 'এমন ভোটও হয়!' চড়াম চড়াম ঢাকের বাদ্যি নেই। নেই গুড়-বাতাসা খাওয়ানোর হুমকি। 'মারের বদলা মার' স্লোগানও ফিকে। এবারের ভোটে রইল শুধুই অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য। ইভিএম-এর বোতাম টেপার পর প্রত্যেক ভোটারের চোখে মুখে প্রতিফলিত হচ্ছিল গণতন্ত্রের উৎসবে অংশগ্রহণের আনন্দে এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তির ঝলক। হিংসা ভুলে শান্তির পথ খুঁজে নিল উত্তরবঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে বিগত ৫০ বছরে রক্তপাতহীন, মৃত্যুহীন, হিংসাহীন এমন ভোটের নজির নেই। ফলে এমন ভোট দেখেছে বলে মনে করতে পারছেন না কেউই। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক হানাহানি, পাড়ায় পাড়ায় দাদাগিরি, আর বোমা-বন্দুকের আওয়াজে ক্লান্ত মানুষ আজ শুধু শান্তি চায়।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনেক বছর ধরেই সেই ভয়ের খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব যাদের হাতে সেই নির্বাচন কমিশন যদি চায় তাহলে তারা যে মানুষের এই সামান্য চাওয়াটুকু পূরণ করতে পারে এবারে নির্বাচনে সেটাই প্রমাণ হয়ে গেল। হ্যাঁ, জ্ঞানেশ কুমারের কথাই বলা হচ্ছে। ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাকে 'ভ্যানিশ কুমার' বলে কম গালি দেওয়া হয়নি। তাকে মাটি খুঁড়ে বের করে আনার হুমকি দেওয়া থেকে শুরু করে সংসদে ইমপিচ করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি দমে যাননি। ৩৫ বছর বাম শাসন ও ১৫ বছর তৃণমূল শাসনে লালিত পালিত গণতন্ত্র হত্যাকারী ভাইরাসগুলোকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। প্রশাসনকে গণতন্ত্র হত্যাকারী ভাইরাসমুক্ত করতে নির্বাচন কমিশন শুরুতেই মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি-সহ শীর্ষ আমলাদের সরিয়ে দেয়। বদলি করা হয় রাজ্য প্রশাসনের মোট প্রায় ৬০ জন আইএএস ও আইপিএস সিনিয়র অফিসার। ১৩ জন আইএএস অফিসারকে জেলাশাসক ও ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার হিসেবে নতুনভাবে নিয়োগ করা হয়। ৭৩ জন রিটার্নিং অফিসার-সহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার হিসেবে কর্মরত ৮৩ জন বিডিওকে বদলি করা হয়। ১৯ জন আইপিএস অফিসার যার মধ্যে ৬ জন পুলিশ কমিশনার, ১২ জন জেলা এসপি এবং কলকাতা পুলিশের একজন ডিসিকে বদলি করা হয়। মোট ১৮৪ জন পুলিশ অফিসার বদলি করা হয় যার মধ্যে ১৭৩ জন থানার ওসি/আইসি। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ১ জন করে মোট ২৯৪ জন জেনারেল অবজার্ভার (আইএএস) নিয়োগ করা, বুথ কেন্দ্রে রাজ্য পুলিশের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা, বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে পরিচয় পত্র-সহ প্রবেশের পর আরও দুই ধাপে ভোটারের পরিচিতি পরীক্ষা করা-সহ উত্তরবঙ্গে প্রায় ৮০০-৮৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ফলস্বরূপ শূন্য মৃত্যু, শূন্য বোমা নিক্ষেপ।

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনা করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সত্যিই এক ঐতিহাসিক রেকর্ড স্থাপন করলেন। তিনি শুধু ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়ে উঠলেন না, তিনি হয়ে উঠলেন— 'ম্যান অব দ্য সিরিজ'। তিনি সত্যিই একজন স্মরণীয় কিংবদন্তী। স্যালুট জ্ঞানেশ কুমারকে। পশ্চিমবঙ্গকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য, পাঁচ দশক পর পশ্চিমবঙ্গকে অন্য রাজ্যের সম ভাবমূর্তিতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তকে। বাঙ্গালি ব্রিটিশ তাড়িয়েছে, বাঙ্গালি তোলাবাজদেরও তাড়াবে।

সামান্য কিছু বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তারও সমাধান করা হয়েছে তৎপরতার সঙ্গে। প্রশাসনে ব্যাপক রদবদলই যে নির্বাচনে ভয়ের বদলে ভরসার জন্ম দিয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই বিপুল সংখ্যক ভোটের শতাংশ ঝামা ঘষে দিয়েছে বাম ও তৃণমূল জমানায় গড়ে উঠা রাজ্যের পক্ষপাতদুষ্ট আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুখে।

এই ভয়মুক্ত পরিবেশ সমস্ত ভোটারকে ভোটদানে উৎসাহিত করেছে। মুসলমানরা চিরকাল ১০০ শতাংশ ভোট দিয়ে থাকে। সুতরাং মুসলমান ভোট বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটার ছিল ৭,৩৪,১৪,৭৪৬ জন। তার মধ্যে ভোট দিয়েছিলেন ৬,০৩,২২,৮৩৪ জন। ২০২৬ সালে ভোটার ছিল— ৬,

৮২,৫২,৬০৩ জন। তার মধ্যে ভোট দিয়েছেন— ৬,৩৩,৭৪,৬৬৭ জন। অর্থাৎ ২০২১-এর তুলনায় মোট ভোটার কমলেও প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা বেড়েছে— ৩০,৫১,৮৩৩টি। স্বাভাবিক যুক্তিতেই বোঝা যায় যে বাড়তি ভোট যাদের থেকে এসেছে তারা হলেন এই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ভোটার। হিন্দুরা এমনিতেই ভোট সচেতন নন, তারা আজ পর্যন্ত ভোটব্যাংক তৈরি করতে পারেনি। প্রচলিত রাজনীতির ভোটব্যাংক থিয়োরি সন্দেহাতীতভাবে মুসলমান ভোটারদের প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচিত বিষয়। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এই মুসলমান ভোটব্যাংককে খুশি করার জন্য সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলো মুসলমান সম্প্রদায়কে এক পৃথক সুবিধাভোগী গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যার বিষময় পরিণাম আজ সারা ভারতবর্ষ ভোগ করছে। বামফ্রন্টের ৩৫ বছর ভোটব্যাংকের নামে মুসলমান তোষণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছিল। মমতা ব্যানার্জির ১৫ বছরের রাজত্বে সেই মুসলমান তোষণ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বড়ো অংশের মধ্যে আন্তর্জাতিক জেহাদি মানসিকতা ও তার প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে 'পশ্চিমবঙ্গ'কে জামায়াতে ইসলামির গ্রেটার বাংলাদেশ পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করার মানসিকতা সৃষ্টি করেছে। অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ভারতে ঢোকা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় ঢুকিয়ে, তাদের আধার কার্ড-সহ যাবতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দিয়ে জামাতে ইসলামের ভারত দখলের পরিকল্পনাকে সহায়তা করতে মমতা ব্যানার্জি এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। চিকেন নেক বিচ্ছিন্ন করে সেভেন সিস্টার্স দখলের জেহাদি স্বপ্নের কথা সর্বজনবিদিত। এসআইআর নিয়ে আন্দোলনের নামে মোথাবাড়িতে চিকেন নেক অবরুদ্ধ করার যে ট্রায়াল হয়েছিল তাতে, ওয়াকফ আন্দোলন ও পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের মৃত্যুতে প্রতিবাদের নামে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় চিকেন নেক অবরুদ্ধ করার ট্রায়ালে মমতা ব্যানার্জির প্রশাসন সরাসরি মদত জুগিয়ে ছিল। কলকাতা হাইকোর্ট এই অবরোধের তদন্ত করার জন্য এনআইএ-কে তদন্তভার দিয়েছিল। মমতা ব্যানার্জি সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল এই তদন্ত ঠেকিয়ে জামাতপন্থীদের স্বপ্নকে সফল করার জন্য।

এবার রেড রোডে ইদের নামাজে গিয়ে মমতা ব্যানার্জি হিন্দিতে দেওয়া ৬-৭ মিনিট এর বক্তব্যে বড়জোর এক মিনিট শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন বাকি সময় এসআইআর-এর বিরোধিতা, বিজেপি- বিরোধিতা -সহ প্রধানমন্ত্রীকে গালিগালাজ করেছেন। বাংলাদেশের জামাতিরা যে ভাষায় প্রধানমন্ত্রীকে গাল দেয় ঠিক একই ভাষায় মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রীকে দেশের সবচেয়ে বড়ো অনুপ্রবেশকারী বলে গাল দিয়ে হাততালি কুড়িয়েছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করা সেই সঙ্গে দেশের রাষ্ট্রপতিকে অপমান করা সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। সেই জামাতি জেহাদিদের মনোরঞ্জনের জন্য নিরন্তর তিনি ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে গিয়েছেন। বাংলাদেশে যেমন পাকিস্তানপন্থী রাজাকারদের হাতে নিরন্তর বাঙ্গালি চেতনা, বাঙ্গালি অস্তিত্ব আক্রান্ত হচ্ছে, ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও পশ্চিমবঙ্গের রক্ষাকর্তার ছদ্মবেশ ধারণ করে বাঙ্গালি চেতনাকে নিরন্তর হত্যা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের জন্য মোট বরাদ্দ প্রায় ৫,৭১৩.৬১ কোটি। মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে আর যাই হোক এরা নিশ্চয়ই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা বিজ্ঞানী হবে না। অন্যদিকে বঞ্চিত উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৯২০.১৩ কোটি টাকা । সন্দেহ নেই সরকারি টাকায় পশ্চিমবঙ্গের ইসলামিক তন্ত্র বিস্তারের এর চাইতে বড়ো দৃষ্টান্ত আর নেই। বাংলাদেশের চিন্ময় প্রভুর মতো পশ্চিমবঙ্গের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজকে গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা, বাংলাদেশের দীপুচন্দ্র দাসের মতো বেলডাঙ্গার হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের নির্মম হত্যা, পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে-স্কুলে সরস্বতীপূজার উপর নিষেধাজ্ঞা, দুর্গাপূজার বিসর্জনে বাধা দেওয়া, পূজোর প্যান্ডেলে আজানের মাইক বাজানো, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান-বহুল এলাকাগুলোতে বছরভর নানা অজুহাতে দাঙ্গা বাঁধিয়ে হিন্দুদের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য করা, জয় শ্রীরাম বললেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা, সিএএ-র বিরোধিতার নামে প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুদের নাগরিকত্ব অর্জনে বাধা দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষার আতঙ্কের জন্ম দিয়েছিল যা কিনা সংগঠিতভাবে ভোট দিয়ে এই হিন্দু বিরোধী শক্তিকে অপসারণ করার এক চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছে। যার জন্য অনেক জায়গাতেই মুসলমান বহুল বুথ গুলোর তুলনায় হিন্দু বহু বুথগুলোতেও ভোটের হার বেড়েছে। এই সমস্ত ভোট কোনোভাবেই হিন্দু বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসের বাক্সে পড়ার সম্ভাবনা নেই। পরিযায়ী শ্রমিকরাও দলবেঁধে ভোট দেওয়ার জন্য এসেছে। ট্রেন থেকে নেমেই দলে দলে জয় শ্রীরাম ধ্বনি তুলে গ্রামে পৌঁছে অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে বিজেপির প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ভোট তৃণমূল কংগ্রেস পাবে না। এছাড়াও এসআইআর-এর পরে প্রথম ভোট দিতেই হবে এই ভয়ও অনেকের মধ্যেই কাজ করেছে। তবে এই ভয় থেকে ভোট তৃণমূল কংগ্রেসের বাক্সে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ এখানে কর্মসংস্থান নেই, শিল্প নেই, কারখানা নেই, মানুষ নিরুপায় হয়ে কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে পাড়ি জমাচ্ছে। ঘুষের বিনিময়ে চাকরি বিক্রি হচ্ছে। কামদুনি থেকে আরজি কর একটি নারী নির্যাতনেরও ফয়সালা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো ছিল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্বভাব। এসআইআর-এর শেষ পর্যায়ে কালিয়াচকের মোথাবাড়িতে শোনা যায় মহিলা বিচারকের আর্তনাদ।

সমস্ত ঘটনা তৃণমূলের জঙ্গল রাজের বিরুদ্ধে মানুষকে খেপিয়ে তুলেছিল যার প্রতিফলন ভোট বাক্সে ঘটেছে। তৃণমূলনেত্রী এসআইআর-এর বিরুদ্ধে মানুষকে খেপিয়ে তোলার যে কাজ নিরন্তর করে গিয়েছেন, তাতে যারা ভোটার তারা প্রভাবিত হয়নি, কারণ ভোটাধিকার হারানোর উত্তাপ তাদের কাছে পৌঁছায়নি। আর যাদের কাছে পৌঁছেছে তাদের তো ভোটার তালিকায় নামই নেই। ২০২৬-এর এই ভোটকে সারা ভারতবর্ষ মনে রাখবে মূলত দু'টি কারণে একটি সর্বোচ্চ ভোটদানের হার (৯২.৮৫ শতাংশ); অন্য কারণটি হল হিন্দু ভোট সংহত হওয়ার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের জন্য। □

শাসকদলের হামলা : ভয়, হতাশা নাকি পরিবর্তনের আগাম সংকেত

বেহালায় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে রাজ্যজুড়ে। অভিযোগের তির তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। ঘটনাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে, কারণ তাদের মতে এটি শুধুমাত্র আক্রমণ নয়, বরং দেশপ্রেম ও সাংগঠনিক আদর্শের উপর আঘাত। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা দীর্ঘদিন ধরে সমাজসেবা, জাতীয় চেতনা জাগরণ এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের বার্তা বহন করে চলেছেন। বন্যা, দুর্যোগ কিংবা সামাজিক সংকটের সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে যুব সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা ও স্বাভিমান জাগ্রত করে তোলার ক্ষেত্রে সঙ্ঘের ভূমিকা বহুবার সামনে এসেছে। সেই সংগঠনের কর্মীদের উপর প্রকাশ্যে হামলার ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত বদলাতে থাকা রাজনৈতিক পরিস্থিতি শাসকদলের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠছে। জনসমর্থনের ভিত দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা থেকেই বিরোধী মত ও রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠছে। বিরোধী শিবিরের দাবি, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝে গেছে কারা উন্নয়নের কথা বলে আর কারা সন্ত্রাসের রাজনীতি করে।' এই ঘটনার পর বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, গণতন্ত্র কি মতাদর্শের মোকাবিলা, যুক্তি দিয়ে হবে, নাকি হামলা ও ভয় দেখিয়ে? বেহালার ঘটনা সেই প্রশ্নকেই আরও জোরালো করেছে। রাষ্ট্রবাদী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে যদি রাষ্ট্রবাদী শক্তির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে রাজনৈতিক সন্ত্রাসে জড়িত প্রত্যেক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তির দাবিও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। রাজ্যের রাজনৈতিক আকাশে এখন একটাই প্রশ্ন ঘুরছে— এই হামলা কি শুধুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নাকি এটি আসন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনের আতঙ্কে শাসকশিবিরের অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ? সময়ই তার উত্তর দেবে, তবে বেহালার ঘটনা বিতর্ককে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা।

বেহালায় স্বয়ংসেবকদের উপর আক্রমণ রাজ্যের শাসক দলের

নির্বিঘ্নে দ্বিতীয় দফার ভোট পর্ব মিটতেই, নতুন নাটক রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের। গত ২৯ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর, রাতে শাসক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দু'জন স্বয়ংসেবককে বেধড়ক মারধর করে। এরপর দোষকে আড়াল করতে অন্য এক মারামারির ঘটনায় স্বয়ংসেবকদেরই ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে থানায় ডায়েরি করে, পরে পুলিশ এসে ওই স্বয়ংসেবকদের ধরেও নিয়ে যায়। এদিকে একটি স্থানীয় সূত্রের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে, নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে এক তৃণমূল নেতার মাথায় নাকি চোট লাগে, আরও কয়েকজন আহত হন। সেই মারামারির ঘটনাকে রাজনৈতিক রং লাগিয়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় বিরোধী দল বিজেপি'র দিকে। এরপর পর্ণশ্রী থানা ঘেরাও করে শাসক দলের কর্মীরা। নেতৃত্বে থাকে বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়।

স্থানীয় মানুষদের বিষয়টি নিয়ে হতবাক হতে দেখা যায়। তাঁরা বলেন, যেখানে বিজেপি'র নামমাত্র সমর্থক নেই, যে জায়গাটা তৃণমূল নেতা অঞ্জন দাসের ডেরা বলেই পরিচিত, যে জায়গাটায় বর্তমান পুরমাতার স্বামীর (তিনিও প্রাক্তন পুরপিতা) একেবারেই নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেখানে কারোর ক্ষমতা নেই কোনো তৃণমূল নেতাকে আঘাত করার। সেখানে কী করে একদল বিজেপি সমর্থক ঢুকে আক্রমণ করে গেল? একজন দু'জন নয়, বেশ কয়েকজনকে (বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী, রত্না চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী) মেরেও গেল, সেটা কী করে সম্ভব? এদিকে আরেকটি বিষয় বয়ানের সঙ্গে মিলছে না। বলা হচ্ছে নাকি ইভিএম বদলানো বা লুঠের পরিকল্পনা ছিল। সেটাকেই রুখতে গিয়ে এই মারামারি। এটা কতটা অবাস্তব, সেটাও বলছেন স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা। তাঁরা বলছেন, এই প্রাক্তন পুরপিতা নাকি এবারে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কোনো কারণে হতে পারেননি। প্রচারের প্রথম দিকে তিনি নাকি একটু নিজেকে সরিয়েও রেখেছিলেন। পরে তিনি রত্না চট্টোপাধ্যায়ের প্রচারে অংশ নেন। তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী কয়েক বারের (১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের) পুরপিতা। ফলে তাঁদের প্রভাব ও সিন্ডিকেট বাহিনীর দাপট এলাকাতে বেশি। সেই বাহিনীর ঘেরাটোপে থাকা এমন একজন ও তাঁর দলবলকে দুই ভাই কী করে মারার ক্ষমতা দেখালো, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।

ওই রবীন্দ্রনগর এলাকায় রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে গিয়ে বিরোধী দল বিজেপি করা প্রায় দুঃসাহসের মতো। এই দুই ভাই অনেক বাধা, বিপত্তি সত্ত্বেও স্বয়ংসেবক হিসেবে রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্রত নিয়ে চলছিলেন। হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তাঁরা প্রচার করছিলেন। এবারে নির্বাচনে বিজেপি'র হয়ে প্রচারে সক্রিয় অংশ নিতেও দেখা যায় তাঁদের। স্থানীয় মানুষ মনে করছে, এটাই হয়তো তাঁদের কাছে এই বিপদ ডেকে এনেছে। যাইহোক, ওই স্বয়ংসেবককে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার কারণে, সে আহত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও কোনো চিকিৎসার সুযোগ পায়নি। যেমন নেওয়া হয়নি কোনো ডায়েরি। এই ঘটনা নিয়ে সঙ্ঘের প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। দোষীদের খুঁজে বের করে, অবিলম্বে শাস্তির ব্যবস্থার দাবি করছেন তাঁরা।

—**জাহ্নবী রায়,**
সোনারপুর, দ: ২৪ পরগনা।

তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৫ বছরে, গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বেড়েছে পাঁচগুণ। কিন্তু এই বৃদ্ধির আড়ালে আছে বিশাল আর্থিক ঋণ, ৮ লক্ষ কোটি টাকার বেশি, ২০১১ সালে ১.৯৩ লক্ষ কোটির জায়গায়। শাসক ও বিরোধী বিজেপির মধ্যে অন্যতম নির্বাচনী বিতর্ক এটা। রাজ্য বাজেটের আয়তন ও জনকল্যাণ খাতে ব্যয় বেড়েছে কিন্তু বিপুল ঋণের বোঝা সামলানোর ক্ষমতা নিয়ে নীতি-নির্ধারক ও সাধারণ ভোটার উভয়েই সন্দিগ্ধ।

২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধায় ৩৪ বছর বামশাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসেন। তখন রাজ্যের বাজেট ছিল ৭৭,৫১০ কোটি টাকা। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেটের সম্ভাব্য অঙ্ক ৪.৬০ লক্ষ কোটি টাকা। এই পাঁচগুণ বৃদ্ধির কারণ সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ। সরকারের যুক্তি এর ফলে গ্রামে ও শহরে গরিব মানুষের হাতে সরাসরি নগদ টাকা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

বামফ্রন্টের শেষলগ্নে রাজ্যের যে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ছিল তা বেড়ে ২০২৫-২৬ সাল নাগাদ ২১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছবে বলে মনে করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় গত তিনটে মেয়াদে রাজ্যে উৎপাদিত সামগ্রী ও পরিষেবার মোট আর্থিক মূল্য বা পরিমাণ ব্যাপক বেড়েছে। সরকারি আধিকারিকরা মনে করেন রাজ্যে বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের ভোগব্যয় বৃদ্ধিই এই অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু রাজ্যে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিবেশ ও পরিস্থিতি খুব খারাপ। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুতর চ্যালেঞ্জ এর বিপুল ঋণ। অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করেছেন রাজ্যের রাজস্বের ব্যাপক অংশ ঋণের সুদ পরিশোধেই ব্যয় হচ্ছে। এর কারণে সরকারের পক্ষে নতুন ঋণ না নিয়ে মূলধন-নিবিড় পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ২০১১ সালের ৫১,৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫-এ ১,৭১,১৮৪ টাকায় পৌঁছেছে, কিন্তু জাতীয় গড় ২,১১,৭২৫ টাকা, তার চেয়ে অনেক পিছিয়ে এ রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের দ্রুত শিল্পোন্নত রাজ্যগুলোর গতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। 'পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে' অনুযায়ী রাজ্যের বেকারত্বের হার ২০১১ সালে ৪.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৩.৬ শতাংশে। কাগজে-কলমে এই হার জাতীয় গড়ের সমতুল্য কিংবা তার চেয়েও ভালো অবস্থানে রয়েছে।

পরিসংখ্যান যাই বলুক শ্রমিকদের অন্য রাজ্যে পাড়ি জমানোর বিষয়টা চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় সমস্যাটা গুরুতর। বিপুল সংখ্যক শ্রমিক এখনও মহারাষ্ট্র, কেরালা, কর্ণাটকে কাজের সন্ধানে পাড়ি জমাচ্ছে। এটা রাজ্যের কর্মসংস্থানের গুণমান ও মজুরি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

পরবর্তী সরকারের সামনে ঋণ-জিএসডিপি অনুপাতের দরুন বিশাল ও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। জনমোহিনী নীতি ও আর্থিক বিচক্ষণতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই হবে আগামী দশকে রাজ্য সরকারের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ; এটা সমগ্র রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে যে দলই সরকার গঠন করুক তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই অত্যন্ত কঠিন আর্থিক পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে। ঋণ-জিএসডিপি অনুপাত ৩৫ শতাংশের ওপর; আরবিআই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এই অর্থ মূলধনী ব্যয়ে ব্যবহৃত হয়নি বলে। ২০১৩ অর্থবর্ষে সুদেআসলে পরিশোধের পরিমাণ ছিল ২৫,০০০ কোটি টাকা এখন সেটা ১.৪০ লক্ষ কোটি টাকা। জিএসডিপি-র তুলনায় রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ১.৭ শতাংশ, যা উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের সুযোগ আরও সীমিত করে। ঋণের এই বিপুল বোঝা কোনো নতুন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বিন্দুমাত্র আর্থিক পরিসর অবশিষ্ট রাখেনি।

২০২৩ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাজেটে নির্ধারিত মূলধনী ব্যয়ের মাত্র ৬৫.৮ শতাংশ এবং ২০২২ অর্থবর্ষে ৫৪.৩ শতাংশ অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৫ অর্থবর্ষে রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণের খাতে মোট ব্যয়ের মাত্র ১.৯ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যেখানে সর্বভারতীয় গড় ৪.৬ শতাংশ। দীর্ঘস্থায়ী প্রবৃদ্ধির স্বার্থে সরকারি ব্যয় সংকোচনের বদলে রাজস্ব আদায় বাড়ানো বেশি জরুরি।

২০২০-২১ অর্থবর্ষে ভারতের মোট শিল্প উৎপাদনে মাত্র ৩.৫ শতাংশ অবদান ছিল পশ্চিমবঙ্গের; অথচ স্বাধীনতার সময় এই হার ছিল ২৫ শতাংশ। বিভিন্ন শিল্প সম্মেলনের আয়োজন হয় কিন্তু রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতিতে আশার আলো দেখা যায়নি।

টিএমসি সরকারের চালু করা নারী, যুব, কৃষকদের উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ হস্তান্তরের বিভিন্ন প্রকল্প অত্যন্ত জনপ্রিয় কিন্তু এতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫,৮৩৮.৯২ কোটি টাকায়। রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা কেন্দ্রের তুলনায় ৩৫ শতাংশ কম। আদালত রায় দিয়েছে মহার্ঘ ভাতা কর্মীদের অধিকার। রাজ্য সরকার পরিবর্তন হলে পরবর্তী সরকারের ওপর এই বকেয়া মেটানোর জন্য অবিলম্বে চাপ সৃষ্টি হবে। □

সন্তানের জীবন গঠনের অমৃত মাতৃদুগ্ধ

ত্রিয়া সিংহ

আধুনিক জীবনশৈলী দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তিত জীবন ধারা— আচার-আচরণ, মন-মানসিকতা-সহ স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। দৈনন্দিন জীবনে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটছে। প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিবর্তে কৃত্রিম খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। সেই রকমই নতুন মায়েদের মধ্যে মাতৃদুগ্ধের পরিবর্তে ফর্মুলা দুগ্ধ বা বিকল্প দুগ্ধ খাওয়ানোর প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধুনা মায়েদের বাচ্চাদের প্রতি অতিচিন্তন এবং নিজ শরীর তন্বী রাখার ভ্রান্ত ধারণার কারণে মাতৃদুগ্ধ পান করানো থেকে বিরত থাকছেন।

যার ফলস্বরূপ নবজাত শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। একটি শিশু জন্মানোর পর তার এক ও একমাত্র খাদ্য হলো মাতৃদুগ্ধ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জীবনের প্রথম ছ'মাসের শিশুকে 'Exclusive Breast feeding' অর্থাৎ একমাত্র মাতৃদুগ্ধ পানের কথা বলেছেন। একটি শিশু জন্মানোর প্রথম দুই-তিন দিন মাতৃস্তন থেকে ঘন হলুদ বর্ণের দুগ্ধ নিঃসৃত হয়, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'কোলোস্ট্রাম' বলা হয়। এই কোলোস্ট্রামের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের Immunoglobulin বা অ্যান্টিবডি (IgA,IgG—ইত্যাদি) থাকে, যা শিশুকে বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। জন্মের পর থেকে প্রথম ছ'মাস পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদান করে মাতৃদুগ্ধ। দেখা যায় অনেকেই বাচ্চা জন্মানোর ২-৩ মাস পর থেকেই ফর্মুলা ফুড খাওয়াতে শুরু করেন। যা কখনোই মায়ের দুধের পরিপূরক নয়।

ফর্মুলা দুধের মধ্যে অ্যান্টিবডি অনুপস্থিত, তাই এটি মাতৃদুগ্ধের মতো রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে না। ফর্মুলা দুধ মাতৃদুগ্ধের তুলনায় শিশুর পক্ষে হজম করা কঠিন। কারণ ওই সময় শিশুর অন্ত্র জটিল খাবার হজম করার জন্য সুগঠিত হয় না। এছাড়াও এটি খাওয়ানোর ফলে অ্যালার্জি, শ্বাসনালীতে সংক্রমণ, ডায়েরিয়া-সহ একাধিক সমস্যা শিশুর শরীরে দেখা যায়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় মায়ের পর্যাপ্ত দুগ্ধ ক্ষরণ হয় না, ফলে শিশুকে ফর্মুলা দুধের ওপর নির্ভর করতে হয়। মায়ের পর্যাপ্ত দুগ্ধক্ষরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মায়ের খাদ্য তালিকার ওপর। এই মতো অবস্থায় মায়েদের সঠিক পুষ্টিগুণমাস সম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। ল্যাক্টেগগ বা স্তন্যদুগ্ধবর্ধক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। যেমন মেথি, মৌরি, রসুন, আদা, হলুদ, ওটস্, বাদাম ইত্যাদি। মাতৃদুগ্ধে উপস্থিত পুষ্টি উপাদান বাচ্চার ছয়মাস পর্যন্ত পর্যাপ্ত হলেও, ছয়মাস বয়সের পর থেকে মাতৃদুগ্ধের পাশাপাশি বিকল্প খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে। তাই শিশুকে ঘরোয়া নরম খাদ্যে অভ্যস্ত করানো হয়, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় weaning বলা হয়, অন্ততপক্ষে দুই বছর কঠিন খাদ্যের পাশাপাশি শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করতে পারে। মাতৃদুগ্ধ পান করানোর ক্ষেত্রে মায়ের যে স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলি পাওয়া যায়, তা হলো— শরীরের অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, জরায়ু দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে, স্তন ও জরায়ুর ক্যানসারের ঝুঁকি হ্রাস পায়। এছাড়াও মা ও শিশুর মধ্যে এক মানসিক বন্ধন তৈরি হয়। যেসব মায়েরা কর্মরত বা বিশেষ কোনো রোগে আক্রান্ত অথবা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খান তাদের ক্ষেত্রে মাতৃদুগ্ধ পান করানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে কর্মরত মায়েরা স্তন্যদুগ্ধ রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করে শিশুকে নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে বোতলের মাধ্যমে পান করাতে পারেন। একটি শিশুর জীবনের প্রথম ছয় মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে সঠিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে না উঠলে এবং মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ না ঘটলে তার ফল আজীবন ভোগ করতে হয়। তাই একটি শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য। □

ঘন ঘন কাশিতে ঘরোয়া সমাধান

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

দীর্ঘদিন ধরে কাশির সমস্যায় ভুগছেন? বিশেষ করে ঋতু বদলের সময়ে গলাব্যথা, খুসখুসে কাশি সাধারণ সমস্যা। অনেকে অ্যালার্জির ওষুধ, কাশির ওষুধ খাচ্ছেন; কিন্তু পুরোপুরি সারছে না।

দীর্ঘদিনের খুসখুসে কাশি একটি বিরক্তিকর সমস্যা। দীর্ঘস্থায়ী কাশি থেকে ঘুম ব্যাহত হতে পারে, ক্লান্তিবোধ থাকতে পারে। এছাড়া গুরুতর ক্ষেত্রে বমি, হালকা মাথাব্যথা এবং বুকে ব্যথা হতে পারে।

দীর্ঘদিনের কাশি নিরাময়ে চিকিৎসকের পরামর্শে কাফ সিরাপ (কফের প্রকারভেদে কফ সাপ্রেসেন্ট অথবা এক্সপেক্টোরেন্ট দেওয়া হয়), অ্যান্টিহিস্টামিন, কর্টিকোস্টেরয়েড, ডিকনজেস্ট্যান্ট ইনহেলার, অ্যাসিড ব্লকার বা ওমেপ্রাজল সেবন করতে পারেন।

এক্ষেত্রে প্রচুর জল ও জুস পান করতে হবে। অতিরিক্ত তরল সেবনে শ্লেষ্মা পাতলা হবে, যা কাশি কমাতে সাহায্য করবে। চা, স্যুপ, কুসুম গরম জল আপনার গলাকে আরাম দেবে।

দীর্ঘমেয়াদি কাশির জন্য মধু সেবন কার্যকর চিকিৎসা। গরম চা, আদা চা বা আঙুরের রসে মধু যোগ করে প্রতিদিন অল্প করে খেতে হবে। যদি অ্যাসিড রিফ্লাক্স থাকে, তবে ঘুমানোর দু-তিন ঘণ্টা আগে রাতের খাবার শেষ করতে হবে। অতিরিক্ত ভোজন, ভাজাপোড়া খাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। ওজন কমানো গেলে অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যা অনেক কমে যায়। ঘুমানোর সময় অতিরিক্ত বালিশ দিয়ে মাথা উঁচু করে ঘুমাতে হবে।

শ্বাসনালির আর্দ্রতা বজায় রাখতে ঘরে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন এবং গরম জল ব্যবহার করুন।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য পরিহার করুন। ধোঁয়া, ধুলো, এড়িয়ে চলুন।

ধুলাবালিতে কাশি হলে ঘর ঝাড়ু দেওয়া, ঝুল ঝাড়া ইত্যাদি এড়িয়ে চলুন।

ঠাণ্ডায় সমস্যা হলে স্নানে হালকা গরম জল ব্যবহার করুন। খুব ঠাণ্ডা জল একদম খাবেন না।

গলা পরিষ্কার করতে এবং শ্লেষ্মা থেকে মুক্তি পেতে কুসুম গরম জল লবণ দিয়ে কুলকুচি করুন।

নানা রঙের ফল ও ফাইবার, ফ্ল্যাভোনয়েড-সমৃদ্ধ খাবার দীর্ঘস্থায়ী উৎপাদনশীল কাশি প্রতিরোধে সাহায্য করে।

আপনি ও আপনার শিশু হুপিং কাশির (পারটুসিস) টিকা পেয়েছেন কি না, তা নিশ্চত করুন। দীর্ঘদিনের কাশিতে একেবারেই সময় নষ্ট করবেন না। দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কারণ এমন দীর্ঘস্থায়ী কাশির পেছনে নানা কারণ রয়েছে। যেমন— কোভিড সংক্রমণ, দূষণ, হাঁপানি ইত্যাদি। তাছাড়া নিয়মিত ধূমপানের মতো বিষয় তো রয়েছেই।

আবার অনেক ক্ষেত্রে এক টানা বাড়াবাড়ি রকমের কাশি হলে, তার থেকে যক্ষ্মার লক্ষণ থাকতে পারে। দীর্ঘদিনের কাশি নিয়ে ভারতীয় এক চিকিৎসক বলেছেন, কাশি ৮ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলতে থাকলে, সেটি দীর্ঘস্থায়ী কাশি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এমন দীর্ঘস্থায়ী কাশি যে শুধু বিরক্তিকর ও কষ্টকরই নয়, হতে পারে আপনার অ্যাজমা ধীরে ধীরে জেঁকে বসছে। আর সেই কারণেই কাশতে কাশতে হাঁপিয়ে উঠছেন। এমনটা মনে হলে কিন্তু অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অনেকের ধোঁয়া, দূষণ, ধূমপান, ধুলা, কড়া সুগন্ধী থেকেও এই সমস্যা হতে পারে।

কোভিড বা অন্যকোনো ভাইরাল সংক্রমণের পরে, শ্বাসনালি অ্যালার্জেনের প্রতি অতি সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে। এর থেকে দীঘস্থায়ী কাশির মতো সমস্যা হতে পারে।

বয়স্কদের ফুসফুসের ক্যানসার, ফুসফুসের ফাইব্রোসিস, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজের মতো কিছু অসুখের কারণে দীর্ঘস্থায়ী কাশি হতে পারে। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। □

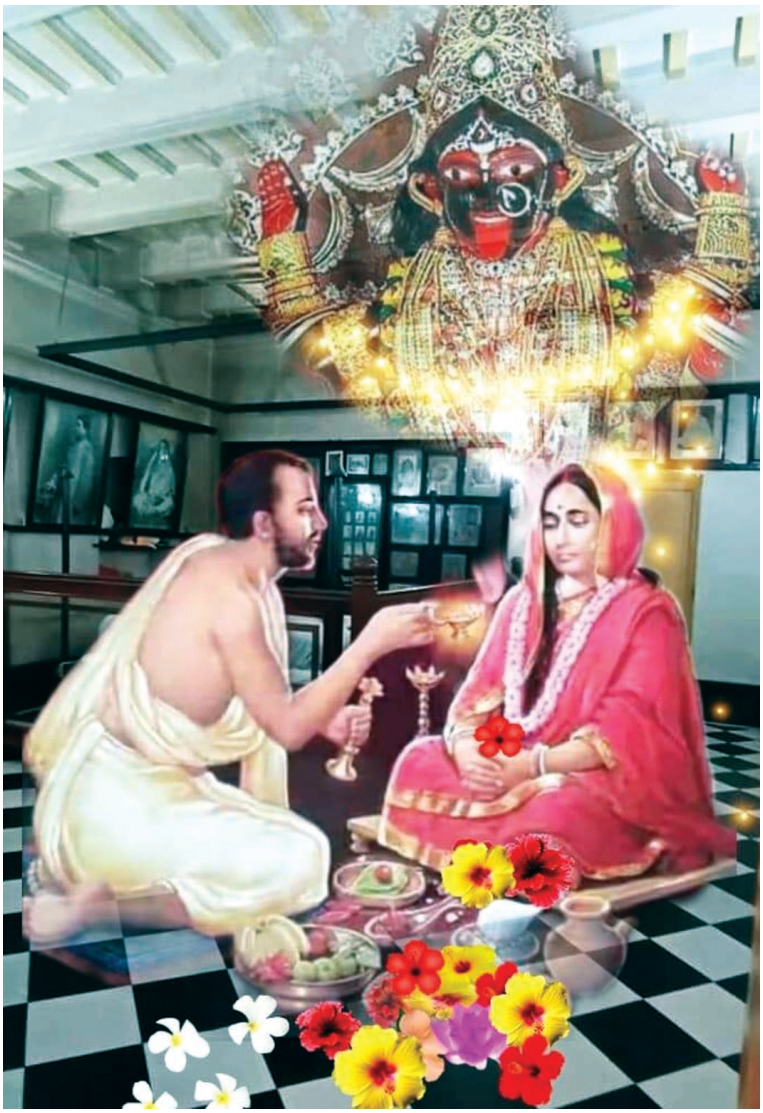

ফলহারিণী পূজার মাহাত্ম্য উপলব্ধিতে মনুষ্য জীবন লাভ করে দিব্য জীবনের সন্ধান

রজত শুভ্র রায়

'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগত্সু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়েতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ।।'
(শ্রীশ্রীচণ্ডী একাদশ অধ্যায়, শ্রীনারায়ণী স্তুতি)

অর্থ ঃ হে দেবী, সমস্ত বিদ্যা তোমারই বিভিন্ন রূপ। এই জগতে যত নারী রয়েছেন, তাঁরা সকলেই তোমারই প্রকাশ। হে জননী, তুমি একাই সমগ্র বিশ্বকে পূর্ণ করে রেখেছ। তোমার স্তব কীভাবে করা যায়? তোমার প্রশংসা করার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই মা।

সহজভাবে অর্থ ঃ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত এই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে, জ্ঞান, নারীশক্তি ও বিশ্বজগৎ— সবকিছুই দেবীর প্রকাশ। তাই তাঁকে আলাদা করে বর্ণনা বা প্রশংসা করা আসলে অসম্ভব, কারণ এই বিশ্ব-চরাচরের যাবতীয় বহিঃপ্রকাশের সবই তাঁরই রূপ।

তারিখটি ছিল ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮৭২ সালের ৫ জুন তিথি ছিল) ফলহারিণী অমাবস্যা। নক্ষত্র মৃগশিরা।

সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ রাত ঠিক নয়টার সময় স্বীয় ধর্মপত্নী মা সারদা কে তাঁর নিজের কক্ষে ডাকলেন। পিঁড়িতে বসতে দিলেন শ্রীশ্রীমা-কে। মা অল্প হলেও বিস্মিত। ঠাকুরের আচরণ অন্য দিনের তুলনায় আজ একটু ভিন্ন। যাইহোক তিনি পতি অন্ত প্রাণ, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর যা বললেন উনি তাই করলেন অর্থাৎ পিঁড়িতে বসলেন।

এরপর শুরু হলো আসল কৃত্য। হঠাৎ শ্রীঠাকুর মা-কে সর্বপ্রকার আভূষণে ভূষিত করে ফুলের মালা, সামনে পূজার ফল, নৈবেদ্য অর্পণের উদ্দেশ্যে রেখে শুরু করলেন মন্ত্রপাঠ।

কিন্তু এ কী! শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবগ্রস্ত হয়ে মহামায়ার সম্পূর্ণা পূর্ণশশী রূপ মা ষোড়শী ললিতা মহাত্রিপুরাসুন্দরীর মন্ত্র পাঠ করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন! সঙ্গে শ্রীশ্রীমা-ও যোগ সমাধিতে লীন হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ সমাধিস্থ থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সারাজীবনের সাধনা, তাঁর সাধনমালা, পূজার ফল, নৈবেদ্য-সহ সমস্ত জীবনের কর্মফল সব শ্রীশ্রীমায়ের চরণে সমর্পণ

করলেন। উন্মোচিত হলো সেই ভয়ঙ্কর অমানিশাতে জ্ঞানের সেই পূর্ণশশী রূপ।

ওঁ অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।।

ভারতবর্ষের আকাশ তখন অমাবস্যার অমানিশায় আচ্ছন্ন। সত্যের অনুসন্ধানই যে সনাতন ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য সেই বোধ হারিয়ে গিয়েছে। তুর্কি-পাঠান-মুঘলদের দীর্ঘ অন্ধকারময়, অপশাসনের পর দেশবাসীর মধ্যে ভারতবোধ জাগতে না জাগতে আবার ম্লেচ্ছ ইংরেজ বাহিনী এসে ভারতবর্ষের বুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাককে লালকেল্লাতে উড়িয়ে ভারতের প্রভুত্বের চিহ্নটি ধারণ করেছে। ভারতবর্ষের ওপর করেছে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'-এর দণ্ড নীতির বিষম প্রয়োগ। এক হাজার বছরের দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন ভারতবাসী ভুলে যায় যে, ভারতবর্ষই একদা সমগ্র বিশ্বকে শিখিয়েছিল শত্রুকে পরাজিত করতে শম আদি চার দণ্ড নীতির। দীর্ঘ পরাধীনতার কারণে জাতির জীবনকে গ্রাস করে হীনম্মন্যতা। ভারতবর্ষের বুক থেকে যেন হারিয়ে যায় রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধের সেই যোদ্ধৃ দর্শন যা চিরকাল ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে করেছে বীরত্বের সেই দুর্মম প্রয়োগ। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন তমোগুণে নিমগ্ন জাতিকে আলোর দিশা দেখাতে ভারতবর্ষের বঙ্গক্ষেত্রে জন্ম নিলেন সাক্ষাৎ আদিত্যনারায়ণ— 'শ্রীরামকৃষ্ণ' রূপে। দেখালেন আত্মদর্শনের সেই চিরাচরিত পথ যা কখনো বৈদান্তিক দর্শনের মধ্য দিয়ে সেই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে অদ্বয় ভাবকে প্রকাশিত করেছে, বা কখনো নিখাদ প্রেম, ভক্তির রাস্তায় দ্বৈত ভাবকে পুষ্ট করে সে ভারত হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী মাতৃ রূপ, বা কখনো শ্যাম ও শ্যামার এক ব্রহ্মের দুই ভিন্ন ভিন্ন রূপকে প্রকাশিত করেছে। কারণ তাছাড়া জাতিকে উদ্ধারের পথ দেখাবে কে? কীভাবে উদ্ধার পাবে বঙ্গ তথা ভারতবর্ষ যা একদিন সুনীল জলধি হইতে উত্থাপিত হয়েছিল। জাতির উদ্ধার না হলে যে মাতৃতত্ত্ব ভারতবর্ষকে উদ্ধার করে এসেছে যুগে যুগে সেই নারী হয়ে যাবেন শুধু যৌনযন্ত্রের স্বরূপ, ভোগের বস্তু মাত্র। সেটা হলে ভারতবর্ষ কীভাবে বাঁচবে? কীভাবে বাঁচবে লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন সনাতন সংস্কৃতি? কে দিশা দেখাবে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র জগৎকে?

সেইজন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর নিলেন সেই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা যাতে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশ তাঁর দেশের উদ্ধার করে প্রথমে নিজেকে, পরে সমগ্র পৃথিবীকে জানাতে পারে— 'নারী-পুরুষের বিবাহিত জীবন শুধু ভোগের নিমিত্ত মাত্র নয়, বরং জগজ্জননী আদ্যাশক্তি এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক নারীতে উপস্থিত, এমনকী নিজের স্ত্রীর মধ্যেও তিনি বিদ্যমান'। জগজ্জননী যে রাত্রিতে সকলের কর্মফল হরণ করেন সেই ফলহারিণী অমাবস্যা নিশিতে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় পত্নী মা সারদামণিকে মাধ্যম করে সকল কর্মফল, সাধনা, চতুর্বিধ পুরুষার্থ ফল সেই আদ্যাশক্তির শ্রীরাতুল চরণে সমর্পণের মধ্যে দিয়ে অর্জন করলেন যে তৃপ্তি, সেই তৃপ্তিকেই ভারতবর্ষ মুখ্য করে গড়ে উঠেছে, জ্বালিয়েছে আত্ম শিক্ষার আলো, পচনশীল মরণশীল শারীরতত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে আগুনের পরশমণি স্বরূপ অমৃতের আধার আত্মতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করাই হলো মানব হতে দেবত্বে উত্তরণ। 'তোমা হইতেই জাগিবে বিশ্ব'-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ ভিন্ন অন্য আর কী-ই বা হতে পারে? ফলহারিণী অমাবস্যা নিশিতে অতি অধম, কুলাচারহীন, কদাচারে লীন একজন মাতৃভক্তও নানাবিধ ফল অর্পণ করে স্বীয় গৃহের মাতৃমণ্ডলীকে দেবী জ্ঞানে পূজা নিবেদন করলে চতুর্বর্গ ফলপ্রদায়িনী দেবীর আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন। এই হলো ফলহারিণী অমাবস্যা তিথি ও ফলহারিণী কালীপূজার মাহাত্ম্য। শ্রীশ্রীমায়ের মতো মহাসমুদ্রের কথা ব্যাখ্যার ধৃষ্টতা এই ভূ-ভারতে কারও নেই। মাতৃজাতিকে দেবীজ্ঞানে সাধনাই ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পরম্পরার মূল ভিত্তি।

প্রকৃতি-স্বরূপিণী 'নারী' হলেন পুরুষের 'শক্তি'। পুরুষ ও প্রকৃতি একত্রে এই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সৃষ্টি তথা জীবনীশক্তির ধারা প্রবহমান রেখেছে। পরমা প্রকৃতি-স্বরূপিণী নারীকে শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন তাই পুরুষ জাতির পবিত্র কর্তব্য। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন হলো— সমগ্র মনুষ্য সমাজের কাছে আদর্শ। শ্রীশ্রীমায়ের আরাধনার মধ্য দিয়ে অপার লীলাময় শ্রীশ্রীঠাকুর কর্তৃক উপস্থাপিত এই জীবনাদর্শ আপামর মনুষ্য জাতির কাছে চির-অনুসরণীয়। শ্রীশ্রীঠাকুর কৃত আচার-আচরণ অনুসরণ সাধারণ মানুষের জীবনের পরম সাধনা স্বরূপ। এই সাধনার মাধ্যমেই মনুষ্য জীবন লাভ করে দিব্য জীবনের সন্ধান। মনুষ্য জীবনের উত্তরণ ঘটে দিব্য জীবন অভিমুখে। দেবী ললিতার চিন্ময়ী রূপ যা শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সমাজের মাতৃমণ্ডলীর মধ্যেও যাতে সদা-সর্বদা সেই রূপের প্রকাশ সকলে দর্শন করে এবং মাতৃজাতিকে সম্মান-শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে দিব্য জীবনের অধিকারী হয়— সেই চিরন্তন ভারতীয় পরম্পরার কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায় ফলহারিণী পূজা। □

যে গান দেশকে মা করে তুলল
বঙ্কিমচন্দ্রের অমর দান বন্দে মাতরম্

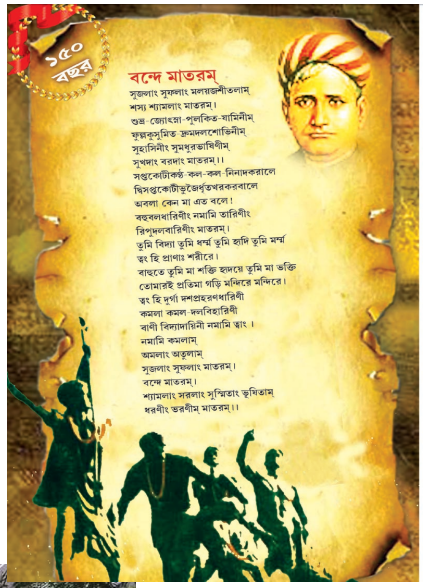

ড. জয়দেব বিশ্বাস

নৈহাটির কাঁঠালপাড়া— এই নাম উচ্চারণের মধ্যেই যেন এক ঐতিহাসিক শিহরণ জেগে ওঠে। কারণ এই মাটিই একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি, অন্যদিকে বন্দে মাতরমেরও জন্মভূমি। সেই পবিত্র ভূমিতে 'বন্দে মাতরম্'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ৫ এপ্রিল ২০২৬, পশ্চিমবঙ্গ লোকপ্রজ্ঞার উদ্যোগে এক অনুভবী, সার্থক ও চেতনা-উদ্দীপক অনুষ্ঠানের আয়োজন— এ যেন ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের এক জীবন্ত সংলাপ।

সূচনাতেই কস্তুরী পাণ্ডের সংগঠন মন্ত্রে অনুষ্ঠানের পরিবেশ গম্ভীর ও মননশীল হয়ে ওঠে। তার পরেই রিমা মালিকের কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত— যেন উপস্থিত সকলকে এক সূক্ষ্ম আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ডাঃ আশিস মণ্ডলের আন্তরিক, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুসংহত স্বাগত ভাষণ অনুষ্ঠানটির বৌদ্ধিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তোলে।

এই পরম্পরার মধ্যেই মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় প্রজ্ঞা প্রবাহের সহ-সংযোজক চন্দ্রকান্ত শর্মা। তিনি তাঁর ভাষণের সুচনাতেই এক গভীর অনুভূতির প্রকাশ ঘটান— 'বন্দে মাতরমের জন্মভূমি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমিতে দাঁড়িয়ে এই বিষয় নিয়ে বলতে পারা আমার পরম সৌভাগ্য।'

এই একটি বাক্যেই যেন সময় অনুষ্ঠানের আবেগ, গৌরব ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য সংহত হয়ে ওঠে। তাঁর বক্তব্য ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় সেই মূল চিন্তার দিকে— ভারতবর্ষকে 'মা' রূপে দেখার চিরন্তন ঐতিহ্য এবং সেই ভাবনাকে ভাষা দেওয়ার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা।

অনুষ্ঠানে পূর্বক্ষেত্রের সংযোজক অরবিন্দ দাশ এবং মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক মনোরঞ্জন হাজরা তাঁদের সাংগঠনিক বক্তব্যে এই চেতনার বিস্তৃতি ও প্রাসঙ্গিকতার দিকটি তুলে ধরেন। অপরদিকে রাজ্য বিমর্শ প্রমুখ দেবাশিস ঘোষের কণ্ঠে সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' গায়ন উপস্থিত সকলের মনোযোগ একাগ্র করে তোলে— যেন শব্দের মধ্য দিয়েই মাতৃচেতনার স্পন্দন অনুভূত হয়।

এইরূপ এক আবেগময়, বৌদ্ধিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশেই যে মূল ভাষণটি প্রদান করা হয়েছিল— তারই সম্প্রসারিত ও বিশ্লেষণাত্মক রূপ এই প্রবন্ধ। এখানে মূল প্রশ্ন একটিই, কীভাবে সহস্রাব্দপ্রাচীন মাতৃভাবনার প্রবাহ বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে 'বন্দে মাতরম্' হয়ে জাতীয় জীবনের বীজমন্ত্রে পরিণত হলো?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমাদের প্রবেশ করতে হবে ভারতের চিরন্তন চেতনার গভীরে যেখানে ভূমি কেবল দেশ নয়, 'মা' এবং যেখানে শব্দ কেবল ভাষা নয়, জাগরণের মন্ত্র।

ভারতবর্ষকে 'মা' বলে অনুভব করার যে চেতনা— তা কোনো একদিনের সৃষ্টি নয়; এটি সহস্রাব্দব্যাপী এক সাংস্কৃতিক-আধ্যাত্মিক প্রবাহ। বৈদিক যুগ থেকে রামায়ণ, মহাভারত--- সবখানেই এই মাতৃভাবের গভীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'--- এই উপলব্ধি ভারতীয় মননে দেশকে কেবল ভূখণ্ড নয়, বরং মায়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিন্তু এই চিরন্তন অনুভূতির একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা ছিল— এটি ছিল বিস্তৃত, গভীর, অথচ অনেকাংশে অব্যক্ত। মানুষের হৃদয়ে তা ছিল, কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে তাকে জাগ্রত করার মতো কোনো সংহত ভাষা বা প্রতীক ছিল না।

এইখানেই ইতিহাসে আবির্ভাব ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর অমর সৃষ্টি 'বন্দে মাতরম্' কেবল একটি গান নয়, এটি সেই সহস্রাব্দপ্রাচীন মাতৃভাবনাকে প্রথম সুস্পষ্ট

ভাষা ও ব্যঞ্জনা প্রদান। বঙ্কিমচন্দ্র কোনো নতুন ভাবনার উদ্ভাবক নন; তাঁর অসাধারণত্ব এই যে, তিনি ভারতীয় চেতনার গভীরে বহমান মাতৃরূপী অনুভবকে শব্দে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর কলমে 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং...' ভারতবর্ষ এক জীবন্ত, স্নেহময়ী, শক্তিরূপিণী মায়ের রূপে প্রতিভাত হয়। এই শব্দের মধ্যেই নিহিত ছিল এক 'বীজমন্ত্র'— যা সমগ্র ভারতবাসীর চেতনার মধ্যে প্রবেশ করে তাকে একসূত্রে বাঁধতে সক্ষম হয়। তাই 'বন্দে মাতরম্' কেবল সাহিত্যিক সৃষ্টি নয়; এটি জাতীয় জাগরণের মন্ত্রে পরিণত হয়, বিশেষত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। এরপর যুগে যুগে মনীষীরা এই মাতৃভাবনাকে তাঁদের নিজস্ব ভাষায় সমৃদ্ধ করেছেন— কিন্তু ভিত্তি হিসেবে থেকেছে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই শব্দমন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সঙ্গীতে ভারতমাতাকে 'ভুবনমনমোহিনী' রূপে কল্পনা করেন। তিনি লেখেন— 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী, মঙ্গলময়ী মাতা...' এখানে মাতৃভাব আরও স্নিগ্ধ, আরও সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

শ্রীঅরবিন্দ এই ভাবনাকে দার্শনিক উচ্চতায় উন্নীত করে বলেন— 'Mother India is not a piece of earth; she is a power, a goddess.' অর্থাৎ দেশ আর কেবল আবেগের বিষয় নয়; এটি এক জীবন্ত শক্তি, এক চৈতন্যময় সত্তা। স্বামী বিবেকানন্দ এই মাতৃভাবকে কর্মমুখী জাগরণে রূপ দেন— 'এই মাতৃভূমিই আমাদের জাগ্রত দেবতা।' নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর জীবন দিয়ে প্রমাণ করেন— মাতৃভূমির মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগই সর্বোচ্চ সাধনা।

বিপ্লবীদের জীবনেও এই বীজমন্ত্রের প্রতিফলন দেখা যায়। ক্ষুদিরাম বসুর হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ— এই শব্দমন্ত্রের শক্তিরই প্রতিফলন। মূল সত্য : বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক সেতুবন্ধন : এই সমগ্র ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে— ভারতমাতার ধারণা প্রাচীন, কিন্তু তাকে সর্বভারতীয় চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের।

তিনি সেই চিরন্তন ভাবনাকে ভাষা দিয়েছেন, রূপ দিয়েছেন এবং সর্বোপরি এক সংহত জাতীয় মন্ত্রে রূপান্তরিত করেছেন। তাই 'বন্দে মাতরম্' কেবল একটি গান নয়; এটি ভারতীয় আত্মপরিচয়ের বীজমন্ত্র, যা জাতির চেতনার পরতে পরতে প্রবেশ করে তাকে জাগ্রত করেছে।

ভারতবর্ষকে 'মা' বলে ডাকার মধ্যে যে গভীরতা— তা ইতিহাস, ঐতিহ্য, দর্শন ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমন্বয়। এই দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন অসংখ্য ঋষি-মুনি, সাধক ও মনীষী, কিন্তু সেই অমূর্ত অনুভূতিকে সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাই আজও 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ মানে কেবল একটি ধ্বনি নয়— এটি এক চিরন্তন চেতনার জাগরণ, এক মায়ের প্রতি সন্তানের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আনন্দিত আহ্বান।

নিউ ইয়র্কে কেরালার খাদ্য-সম্ভার

কৌশিক রায়

কেরালা বিখ্যাত কোভালাম সমুদ্র সৈকত আর ব্যাক ওয়াটার্সের জন্য; আলেপ্পি-ক্যুইলন-কোচি-তিরুবনন্তপুরম-কোট্টায়াম-কোঝিকোড়-এর মতো নগরীগুলির জন্য। কোঝিকোড়েতে (কালিকট পূর্বতন)-ই নোঙর ফেলেছিলেন পর্তুগাল থেকে আগত নাবিক ভাস্কো-দা-গামা। তবে, কেরালার নিজস্ব খাদ্য সম্ভারের ঐতিহ্যও নেহাত কম নয়। এই মালয়ালম খাদ্য ঐতিহ্যকে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আমেরিকার নিউ ইয়র্কে 'চাট্টি' নামক একটি রেস্তোরাঁর মাধ্যমে নিয়ে এসেছেন শেফ রেগি ম্যাথিউ।

রেগি ম্যাথিউই প্রথম শেফ যিনি বিদেশে ভারতীয় খাদ্য গরিমাকে প্রসারিত করার জন্য বিশেষ খাদ্য বিপণি বা রেস্তোরাঁ খুললেন। তাঁর এই 'চাট্টি' রেস্তোরাঁ, সাগরপারের মানুষদের রসনার কাছে ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আরও নতুন ভাবে প্রকাশ করাচ্ছে। 'চাট্টি' শব্দের অর্থ হলো— কেরালা রান্নার জন্য ব্যবহৃত মাটির পাত্র। নিউ ইয়র্কবাসীদেরকে ভারতের ঘরোয়া খাবারের স্বাদ দিতে চাইছেন শেফ রেগি ম্যাথিউ, অনেকটা দুই বিখ্যাত শেফ জিগ্‌স্ কালরা এবং সঞ্জীব কাপুরের মতো। ভারতের আঞ্চলিক খাদ্য ঐতিহ্যের যে একটা বিশ্বজনীন গুরুত্ব আছে, সেটা বিদেশবাসীদেরকে বোঝাতে চান রেগি। এর আগে শেফ বিকাশ খান্না, গগন আনন্দ এবং বিনীত ভাটিয়া, সাগরপারের দেশে ভারতীয় আঞ্চলিক খাদ্যের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর চেষ্টা করেও ততটা সফল হননি। অবশ্য, লন্ডনে বিনীত ভাটিয়া-র 'রাসোই' রেস্তোরাঁটি যথেষ্ট নাম কুড়িয়েছে।

কেরালার পালা-তে জন্ম রেগি ম্যাথিউ-র। পড়াশোনা করেছেন কোভালামে। হোটেল ম্যানেজমেন্টের পাঠ নিয়েছেন বেঙ্গালুরুতে। বছর কয়েক আগে কেরালায় 'কাপ্পা চাক্কা কান্ধারী' নামে একটি রেস্তোরাঁও খুলেছিলেন রেগি ম্যাথিউ। মালয়ালম রান্নার তিনটি প্রধান উপাদান কাপ্পা, চাক্কা ও কান্ধারী (KCK) হচ্ছে যথাক্রমে কাসাভা, কাঁঠাল বা এঁচোড় এবং বার্ডস্ আই চিলি নামক একটি বিশেষ ধরনের লঙ্কা। চেন্নাই ও বেঙ্গালুরুতেও এই রেস্তোরাঁটির শাখা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। রেগি ম্যাথিউ এখন অনেকগুলি পুরস্কার পেয়ে কেরালার খাদ্য ঐতিহ্যের পোস্টার বয়ে পরিণত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কেরালার আর এক প্রসিদ্ধ রাঁধুনি শেফ সুরেশ পিল্লাইয়ের তুলনা করা চলে। নিউ ইয়র্কে কেরালার সনাতনী রন্ধনপদ্ধতি নিয়ে যাওয়ার জন্য রান্নার গোপন সূত্র শিখতে রেগি ম্যাথিউ কেরালার ৩০০টি পরিবারে ঠাকুমা-দিদিমাদের কাছে বিভিন্ন পদ রান্নার ঐতিহ্যবাহী উপকরণ বা মশলা সম্পর্কে জেনেছেন। জেনেছেন আমিষ ও নিরামিষ-এর বিভিন্ন পদ কীভাবে রান্না করতে হয়। সেই রহস্যকেই রেগি ম্যাথিউ নিয়ে গেছেন নিউ ইয়র্কের মানুষদের রসনাকে পরিতৃপ্ত করতে। এমনকী, কেরালার হোটেল, রেস্তোরাঁ দোকান থেকে বিভিন্ন মালয়ালি রান্নার রেসিপিকে জানতে পেরেছেন রেগি ম্যাথিউ। 'ত্যাপাস' নামক খাবারটি

যেভাবে স্পেনীয়দের কাছে পরিচিত, সেইভাবে কেরালার খাবারগুলিকেও নিউ ইয়র্কের সব ধরনের বাসিন্দাদের কাছে পরিচিত করিয়েছেন রেগি ম্যাথিউ। তবে, হাডসন নদীর তীরের এই ধনাঢ্য শহরটির জনপ্রিয় ফাস্ট ফুড আউটলেটগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। তবুও, নিউ ইয়র্কে ভারতের খাদ্যদূত হয়ে উঠতে চান রেগি।

আগুনের আঁচে ধীরে ধীরে রান্না করার জন্য পিতলের পাত্র বা 'উরলি' তাঁর চাট্টি রেস্তোরাঁতে ব্যবহার করছেন রেগি ম্যাথিউ। কেরালার সবজি বাগান থেকে সরাসরি রান্নার মশলা নিয়ে আসছেন তিনি নিউ ইয়র্কে। 'চাট্টি'-তে কোনো পদেরই মার্কিনীকরণ করেননি রেগি। নির্ভেজাল মালয়ালি পদ্ধতিতে এখানে সমস্ত রান্না হচ্ছে। খাবারে মশলা তিনি এমন পরিমাণে দিচ্ছেন যাতে করে রান্নাটি ঝাঁঝালো না হয়ে ওঠে। 'চাট্টি' রেস্তোরাঁতে খাদ্যরসিকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে 'পিদি অ্যান্ড কোঝি' (মুরগির মাংসের ঝোলের সঙ্গে ধোঁয়া ওঠা ভাত), ভাত্তায়াপ্পাম ও নাপ্পাস (ভাপানো, জারানো চালের পিঠের সঙ্গে নারকেলের দুধ ও মশলাতে থাকা মাংসের টুকরো)। এছাড়াও, চাট্টিতে পাওয়া যাচ্ছে আপ্পাম, পুত্তু ও পরোটার মতো বিভিন্ন স্ন্যাক্স।

কারিমিন পোল্লিচাতু নামক একটি মালয়ালি খাবারের পদ। বিভিন্ন সবজিকে মশালাতে জারিয়ে, কলাপাতায় জড়িয়ে চাট্টিতে পরিবেশন করা হচ্ছে। সামুদ্রিক মাছ দিয়ে 'মৈলি' স্যুপ তৈরি করা হচ্ছে এই রেস্তোরাঁতে। এখানকার বহু খাবারের মধ্যে কলার টুকরো, কোরানো নারকেল, ঝোলাগুড়, ক্যারামেল আর এলাচ বা কার্ডামম-এর মতো কেরালার ঐতিহ্যবাহী রন্ধন উপকরণগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্বর ও কারিপাতাও ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন রান্নাতে।

মার্কিন দেশে বসবাসকারী দক্ষিণ ভারতীয় মানুষরা যাতে আরও বেশি করে তাঁদের জন্মস্থানের খাবারের স্বাদ পাওয়ার জন্য চাট্টি রেস্তোরাঁতে আসেন— তার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন শেফ রেগি ম্যাথিউ। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করছেন বন্ধু ও স্বদেশবাসী অগাস্তিন কুরিয়ান। টাইমস্ স্কোয়্যারের নিকটে অবস্থিত চাট্টি রেস্তোরাঁতে একসঙ্গে ১৬০ জন লোক বসে খাওয়াদাওয়া করতে পারেন।

এখানে এলে মনে হবে— সত্যিই যেন 'ভগবানের নিজের দেশ' কেরালায় পা রাখা সম্ভব হয়েছে। এই চাট্টি রেস্তোরাঁ তৈরি করতে প্রাথমিকভাবে তিন কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন শেফ রেগি ম্যাথিউ। চাট্টি রেস্তোরাঁ শুধু বিদেশে কেরালাবাসীদের জন্যই নয়, ভারতবাসীদের কাছেও গর্বের বস্তু হয়ে উঠবে অদূর ভবিষ্যতে, এমনই আশা প্রকাশ করছেন তিনি। ■

গদখালিতে গোমাতা, ভারতমাতা ও কন্যাপূজন অনুষ্ঠান

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের গদখালি গ্রামের গ্রামবাসীদের উদ্যোগে গত ৩ ও ৪ এপ্রিল গোমাতা, ভারতমাতা ও কন্যাপূজনের আয়োজন করা হয়। ৩ তারিখ সন্ধ্যায় প্রাতঃস্মরণ ও ভাগবত পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর সকাল ১০টায় গ্রামবাসীরা জাগ্রত হড়কাচাড়ি মন্দির থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে কলসযাত্রার মাধ্যমে গঙ্গাবারি আনয়ন করেন। তারপর গোমাতা ও ভারতমাতার পূজা করা হয়। সহস্রাধিক নর-নারী এই পূজানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দুপুরের সহভোজের পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গদখালি স্বামীজী শাখার বার্ষিক কার্যক্রম শুরু হয়। ৫২ জন স্বয়ংসেবক পূর্ণগণবেশে শারীরিক ও বৌদ্ধিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ প্রচারক পরিতোষ সাহা কার্যক্রমে বক্তব্য রাখেন। সন্ধ্যায় ভারতমাতা মন্দিরে যজ্ঞারতি সমাপনের পর প্রসাদ বিতরণ হয়।

৪ তারিখ বিকেলে কন্যাপূজন শুরু হয়। তার আগে গ্রামবাসীরা হরিনাম সংকীর্তন পরিবেশন করেন। আশেপাশের ৪৪ টি গ্রামের ১৫১ জন কন্যাকে তাদের মায়েরা পূজা করেন। ৮ জন পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়ে পূজা সম্পাদন করেন। প্রতিটি কন্যার সাজসজ্জার শাড়ি, ওড়না, বাতাসি, ফুলের মালা এবং পূজার যাবতীয় উপকরণ-সহ বারো রকমের জিনিসপত্র অনুষ্ঠান সমিতির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। কন্যাপূজনের যে মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল তা মহাভারতের যুদ্ধের ব্যূহরচনার অনুকরণে ছিল। এক-একটি ব্যূহের নাম রাখা হয়েছিল দেশের বরণীয়া মাতৃজাতির নামে। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সহ-প্রচার প্রমুখ ড. জিষ্ণু বসু, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ কার্যবাহ সুকুমার নস্কর, সুন্দরবন জেলা কার্যবাহ দেবকুমার হালদার, জেলা প্রচারক বুদ্ধদেব দাস, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক তাপস বারিক প্রমুখ। কন্যাপূজনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ড. জিষ্ণু বসু ও সুকুমার নস্কর। কন্যাপূজা সমাপনের পর ৪০০টি গীতা দান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সাড়ে তিনহাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। শেষে সকলেই সহভোজে সম্মিলিত হন।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

সিউড়ীর নুড়াইপাড়ায় 'শ্রদ্ধা'র শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

বীরভূম জেলার সিউড়ীর বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা গত ১৯ এপ্রিল তাদের ১৭২তম শ্রদ্ধা নিবেদন করে সিউড়ী নুড়াইপাড়ার ৮৪ বছর বয়স্ক নির্মল কুমার মহান্ত মহাশয়কে। তিনবার ব্রহ্মনাদ করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সিউড়ীর সুপ্রাচীন ঔষধ ব্যবসায়ী তথা সংস্থার সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দাস। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। শ্রীমাহান্তকে পূজা করেন তাঁর বৌমা শ্রীমতী বন্দনা মহান্ত দাস। মাল্য নিবেদন করেন সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় ও সুজাতা বিষ্ণু। তাঁর হাতে অর্ঘ্য হিসেবে উত্তরীয়, বস্ত্র, শ্রীগীতা, ফল ও মিষ্টান্ন তুলে দেন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পূর্বতন রাজ্য সম্পাদক অনুপকান্তি দাশগুপ্ত, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, ও অমর দে। তাঁর হাতে গাছের চারা তুলে দেন সহ-সভাপতি দামোদর ঘোষাল। মানপত্র পাঠ করেন সহ-সভাপতি আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধা সংস্থার উদ্দেশ্য বিষয়ে বলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গুরু সুব্রত নন্দন, অসীমা মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রাক্ষি মহান্ত। আবৃত্তি করে ঐন্দ্রি মহান্ত। পিতার সম্পর্কে অনুভব বর্ণনা করেন তাঁর পুত্র তথা কল্যাণ আশ্রমের বীরভূম জেলার সহ-সম্পাদক দেবব্রত মহান্ত এবং তাঁর ভাইপো গৌরহরি মহান্ত। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন অধ্যাপিকা চৈতালী মিশ্র। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

শিলিগুড়িতে সীতানবমী উদ্‌যাপন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয় তথা ভারতমাতা মন্দিরে গত ২৫ এপ্রিল মাতৃশক্তি ও দুর্গাবাহিনীর উদ্যোগে সাড়ম্বরে পালিত হলো সীতানবমী অনুষ্ঠান। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বহু সদস্যা, স্বেচ্ছাসেবিকা এবং এলাকার মা-বোন। প্রথাগত শাস্ত্রীয় আচার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, পূজার্চনার মধ্য দিয়ে সীতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। মাতৃশক্তি ও দুর্গাবাহিনীর স্বেছাসেবিকারা ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও ভজন পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণীয় দিক ছিল মাতা সীতার জীবন ও চরিত্র বিষয়ে বৌদ্ধিক আলোচনা। সংগঠনের কয়েকজন সদস্যা সীতামাতার আদর্শ, ধৈর্য, ত্যাগ, ও ধর্মনিষ্ঠার বিষয়ে আলোকপাত করেন। শেষে সমবেত প্রার্থনা ও প্রসাদ বিতরণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

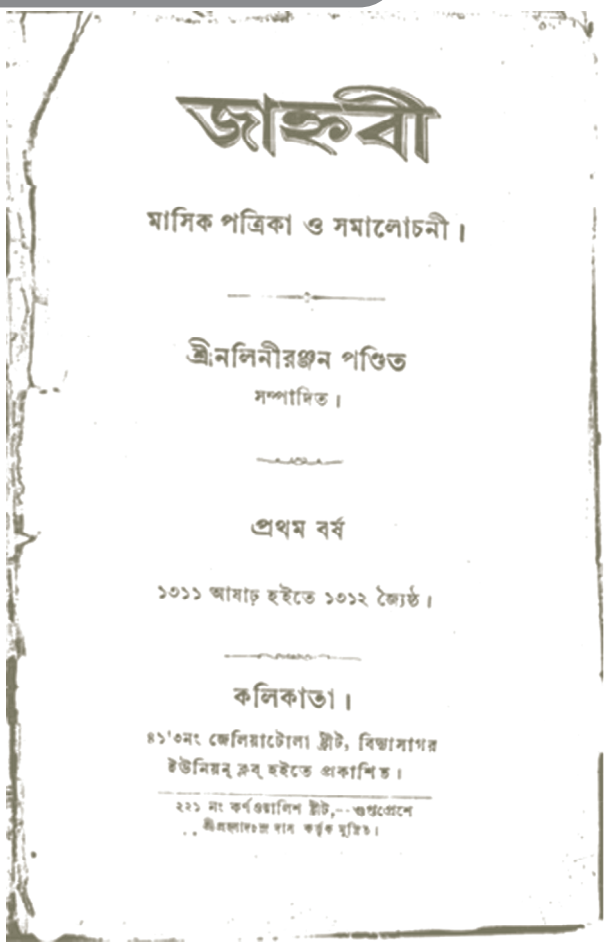
জাহ্নবী

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সম্পাদিত।

প্রথম বর্ষ

১৩১১ আষাঢ় হইতে ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ।

কলিকাতা।

হারানো পত্রিকা—আট

নবীন লেখকদের আঁতুড়ঘর

জাহ্নবী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

একই নামে দু'টি পত্রিকা। প্রকাশকালের ব্যবধান কুড়ি বছর। মাসিক ওই দুই পত্রিকার নাম 'জাহ্নবী'। একটির প্রকাশ উনিশ শতকে, অন্যটির বিশ শতকে। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে হয়, মাসিক 'জাহ্নবী' নামে প্রথম পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বা ১৩১১ বঙ্গাব্দে। প্রথম পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বীরেশ্বর পাঁড়ে আর দ্বিতীয়টির সম্পাদক ছিলেন নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত। পত্রিকা দু'টির নামে অবশ্য ছিল সামান্য পার্থক্য। প্রথমটি শুধুই 'জাহ্নবী' মাসিক পত্রিকা, অন্যদিকে দ্বিতীয়টির নাম ছিল 'জাহ্নবী মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী'। দু'টি পত্রিকাই প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে।

বীরেশ্বর পাঁড়ে সম্পাদিত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ২০নং সিমুলিয়া সুকিয়া স্ট্রিটে। অন্যদিকে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত পত্রিকার প্রকাশস্থল ছিল ৯/১ জোড়াপুকুর স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর ইউনিয়ন ব্লক। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয় পত্রিকাটি ছিল বেশি জনপ্রিয়। বাংলাসাহিত্য ও পত্র পত্রিকার ইতিহাসে দ্বিতীয়টির গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি।

উনিশ শতকে প্রকাশিত 'জাহ্নবী'-র সম্পাদক বীরেশ্বর পাঁড়ে (১৮৪২-১৯১১) ছিলেন 'অদ্ভুত স্বপ্ন', 'আর্যচরিত' 'আর্যশিক্ষা', 'আর্যপাঠ', 'ধর্মশাস্ত্র-তত্ত্ব ও কর্তব্য বিচার', 'মানবতত্ত্ব' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক। মতবাদের দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন রক্ষণশীল হিন্দু। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'জাহ্নবী'-ও ছিল সম্পূর্ণভাবেই তাঁর মতবাদের অনুপস্থী। নীতিবোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য। আর তাই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাতেই 'সূচনা'-য় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়, ''সর্বথা আজি মানুষ পশুভাবাপন্ন বা পশু হইতেও নিকৃষ্ট, সুতরাং পতিত। পতিত উদ্ধার করিবার জন্যই জাহ্নবীর অবতারণা। জাহ্নবী যদি এই পতিত হিন্দুজাতির— এই শাপদগ্ধ ভস্মাবশিষ্ট পদদলিত সগর সন্তানদের উদ্ধার সাধন ও আর্য্যকুলের পূর্বগৌরব পুনরানয়ন করিতে পারেন, তবেই ভারতের মঙ্গল ও আমাদের জন্ম সার্থক। মহর্ষিদের আশীর্বাদে শঙ্করাচার্য যেমন একবার বৌদ্ধ ও নাস্তিক নিরাশ করিয়াছিলেন, আমরা সেই ব্রহ্মর্ষিদের আশীর্বাদ ও নিষ্কাম করুণার গুণে আশা করি জাহ্নবী পবিত্রতোয়া হইয়া পতিত উদ্ধারে সমর্থ হইবেন।''

'সূচনা'-র ওই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণে এদেশে ভোগের বাসনা যেভাবে তীব্র হয়ে উঠছে তার বিরোধিতা করে প্রাচীন আদর্শে মনুষ্যত্বের উজ্জীবন ছিল পত্রিকার মূল লক্ষ্য।

অতিরিক্ত নীতিনিষ্ঠ ও গুরুগম্ভীর রচনাবহুল হওয়ার কারণেই এক বছরের বেশি চলেনি বীরেশ্বর পাঁড়ে সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রিকাটি। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার লেখক তালিকায় ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু, কালীবর বেদান্তবাগীশ, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, হরিচরণ রায় কবিরত্ন, রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ, যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ। লেখকরা সকলেই ছিলেন পণ্ডিত এবং তৎকালীন রক্ষণশীল ধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত।

'জাহ্নবী'-র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রচনার তালিকায় ছিল— 'ঈশ্বর ও ধর্ম', 'ধর্মশাস্ত্রের আবশ্যকতা', 'নিষ্কামকর্ম', 'পাতঞ্জল দর্শন', 'হিন্দুধর্ম বিষয়ক আন্দোলন', 'হিন্দুধর্ম ও নাস্তিকতা' ইত্যাদি। এই তালিকা দেখে বোঝা যায়, পত্রিকাটি ঠিক সাধারণ পাঠকের উপযোগী ছিল না। বিষয়ভাবনা ও প্রকাশ ভঙ্গিমার কারণেই এটি জনমনোরঞ্জনে সমর্থ হয়নি বলে মনে হয়। আর সে কারণেই বীরেশ্বর পাঁড়ের ব্যক্তিগত ওই উদ্যোগ থেমে যায় অকালেই।

বীরেশ্বর পাঁড়ে বা পাণ্ডেরা ছিলেন কনৌজিয়া-ব্রাহ্মণ।

আকবরের সময় তাঁদের পূর্বপুরুষরা বঙ্গদেশে আসেন। যশোরের কামরা গ্রামের অধিবাসী বীরেশ্বর কিছুদিন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ার পর সংস্কৃত শিখতে থাকেন। কাব্য ব্যাকরণ ইত্যাদির পাঠ নেন মোহনচন্দ্র চূড়ামণির কাছে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে 'লীলাবতী বা গণিত বিজ্ঞান' বইটি লিখে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আধুনিকতার বিরোধী বীরেশ্বর পাঁড়ের সাহিত্য সাধনা এগিয়ে চলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিপরীত ধারায়। তাঁর অন্যতম বই 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' বইটি লেখা হয়েছিল কবি নবীনচন্দ্রর 'রৈবতক' কাব্যের প্রতিবাদে। লক্ষ্মীর কৃপাপুষ্ট বীরেশ্বর পাঁড়ের জীবনের অন্যতম কীর্তি কাশীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার।

প্রসঙ্গত, বীরেশ্বর পাঁড়ের ছেলে বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মনমোহন পিতার আদর্শে কাশীতে প্রতিষ্ঠা করেন 'বীরেশ্বর ধর্মশালা'। বাঙ্গালি তীর্থযাত্রীদের কাছে এটি পাঁড়ে ধর্মশালা নামেই খ্যাত। মনমোহন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। ক্লাসিক থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটারেরও লিজ হোল্ডার তথা মালিক ছিলেন এক সময়।

বীরেশ্বর পাঁড়ের 'জাহ্নবী' পত্রিকা বিলুপ্ত হওয়ার প্রায় কুড়ি বছর বাদে প্রকাশিত হয় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের (১৮৮২-১৯৪০ খ্রি:) সম্পাদনায় মাসিক 'জাহ্নবী'। আজীবন সাহিত্যসেবী নলিনীরঞ্জন ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগঠনের এক অক্লান্ত কর্মী। 'সাহিত্যবন্ধু' উপাধিক নলিনীরঞ্জনের জীবনের অন্যতম কীর্তি 'কান্ত কবি রজনীকান্ত' বইটির রচনা। বলা যায় এটাই ছিল রজনীকান্তর প্রথম জীবনচরিত ও সাহিত্য আলোচনা। 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' বইটি তাঁর তথ্যসংগ্রহ লিপি কুশলতার পরিচয় দেয়। নলিনীরঞ্জনের লেখা অন্যান্য বইয়ের তালিকায় রয়েছে 'বাঙ্গলার বাউল সম্প্রদায়' এবং 'স্রোতের ফুল'।

সাহিত্যপ্রেমী এই মানুষটির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'জাহ্নবী মাসিক ও সমালোচনী' পত্রিকা ১৩১১ বঙ্গাব্দ বা ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন নলিনীরঞ্জনের ছেলে সারদারঞ্জন পণ্ডিত। এর থেকে মনে হয়, কেবল পত্রিকা সম্পাদনা নয়, পত্রিকার সমস্ত দায়দায়িত্বই বহন করতে হতো নলিনীরঞ্জনকে। আর তারই প্রভাব পড়তো পত্রিকা প্রকাশনার ওপরও।

'জাহ্নবী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১১-র আষাঢ় মাসে। পত্রিকার প্রথম বছর শেষ হয় ১৩১২-র জ্যৈষ্ঠ মাসে। কিন্তু বিভিন্ন কারণেই আষাঢ় মাস থেকে 'জাহ্নবী'-র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকেই। সে কারণেই গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখে যখন 'জাহ্নবী'-র সম্পাদনা ভার নেন তখন চলছিল পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ।

নলিনীরঞ্জনই সম্ভবত তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের মাধ্যমে গিরীন্দ্রমোহিনী-কে ''জাহ্নবী'র সম্পাদনা ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। গিরীন্দ্রমোহিনী নিজেই সেকথা লেখেন 'জাহ্নবী'তে। তাঁর কথায়, 'যাঁহাদের স্নেহানুরোধ অতিক্রম করা' আমার অসাধ্য, তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে নানা কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পূত জাহ্নবী-বক্ষে এতদিনে আমাকে এইরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হইল। জানি না, পূততোয়া জাহ্নবী নববর্ষে এ অধর্মকে কি আশায় গ্রহণ করিতেছেন।"

সম্পাদনা কাজে গিরীন্দ্রমোহিনীকে সাহায্য করতেন নলিনীরঞ্জনই। তিনিই নিয়েছিলেন পত্রিকাটির সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব। বাংলাসাহিত্যে ''জাহ্নবী'-র ভূমিকার কথা বিশ্লেষণ করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা ছিল। বর্তমান লেখকের সর্বপ্রথম রচনা— 'স্বপ্ন প্রসঙ্গ' এই 'জাহ্নবী' পৃষ্ঠাতেই (আষাঢ় ১৩১৬) মুদ্রিত হইয়াছিল।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৮)।

সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে গিরীন্দ্রমোহিনী 'জাহ্নবী'-র তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাতে লেখেন, ''...'জাহ্নবী'র উদ্দেশ্য কি বলিতে হইলে, মোটামুটি সাহিত্যালোচনাই বলিতে হয়। কিন্তু আজিকার দিনে এই নব চক্ষুরুন্মীলিত সুপ্রভাতে সমাজের শিক্ষাদীক্ষা যে, নূতন পন্থা অবলম্বনে অগ্রসর, তারা নূতন করিয়া না বলিলেও চলে। এই গড়িয়া তুলিবার দিনে যে একপ্রাণতা, বন্ধনদৃঢ়তার আবশ্যক, জাহ্নবী তাহারই প্রার্থিণী। মুখ্যতঃ নির্দিষ্ট সমাজের আচার ব্যবহারের সংশোধন ও ধর্মালোচনাই জাহ্নবীর জীবন-ব্রত।"

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'জাহ্নবী'-র লেখক তালিকায় ছিলেন, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, হেমচন্দ্র বসু, কিশোরীলাল সরকার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্রনাথ সেন, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শশধর রায়, কৃষ্ণসোহাগিনী দাসী, সুরধনী পণ্ডিত, জলধর সেন, সরলাবালা দাসী, সরোজ কুমারী দেবী, কাদম্বিনী দাসী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাকুমার কবিরত্ন, মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ।

প্রথম থেকে 'জাহ্নবী' পাঠকদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে 'জাহ্নবী'-তে দীনেশ সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের লেখাও প্রকাশিত হয়। 'জাহ্নবী' পত্রিকার দাম ছিল বার্ষিক সডাক এক টাকা।

১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'জাহ্নবী'-র সম্পাদক হন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪ খ্রি:)। ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যের সেই ক্রান্তিকালে অন্তঃপুরের দরজা ডিঙিয়ে যে ক'জন মহিলা সাহিত্যের আঙিনায় পা রাখেন গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁদেরই একজন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। বাবা হারান চন্দ্র মিত্র এবং স্বামী নরেশচন্দ্র দত্তর কাছেই লেখাপড়া শেখেন তিনি। ছোটোবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল

লেখালেখিতে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বয়স যখন মাত্র ১৪ সেই সময়ই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রচনা— 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী।' এর এক বছর পরে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'কবিতাহার'। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি যেসব কবিতা লেখেন কবি অক্ষয়চন্দ্র বড়াল তার থেকে যেগুলি বেছে দেন, সেগুলি নিয়েই প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত শোককাব্য 'অশ্রুকণা'। গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ। অবশ্য এর বাইরে রয়েছে 'গিরীন্দ্রমোহিনী গ্রন্থাবলী' নামে একটি সংকলন। তাঁর শেষ রচনা 'হেমচন্দ্র অস্তাচলে' প্রকাশিত হয় 'মানসী ও মর্মবাণী'-র ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায়।

গিরীন্দ্রমোহিনী 'জাহ্নবী' সম্পাদনা করেন ১৩১৪ থেকে ১২১৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিন বছর। তারপর সম্ভবত আর্থিক কারণেই বন্ধ হয়ে যায় নলিনীরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত 'জাহ্নবী'-র প্রকাশনা।

১৩১১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে ১৩১৬ চৈত্র পর্যন্ত সময়কালে 'জাহ্নবী'-র মোট ৭০টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার কথা। কিন্তু ১৩১২ আষাঢ় থেকে চৈত্র পর্যন্ত কোনো সংখ্যা বের না হওয়ার কারণে এই পর্বের 'জাহ্নবী'-র মোট ৬০টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

বিশ শতকের প্রথম দশকে 'ভারতী', 'প্রবাসী' ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা ছিল না। সেই রকম একটা সময় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সম্পাদিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকার বিভিন্ন ধরনের রচনা পাঠকদের মনের খিদে মেটানোর ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

এরকম জনপ্রিয় একটি পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে একটা শূন্যতা তৈরি হয়। পাঠকরাও কিছুটা হতাশ হয়েছিল। এরকম একটা অবস্থায় সুধাকৃষ্ণ বাগচি নামে এক যুবক নতুন করে 'জাহ্নবী' প্রকাশে উদ্যোগী হন। সুধাকৃষ্ণর সাহিত্যরচনা বা পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে খুব একটা যোগ্যতা ছিল তা নয়। কিন্তু প্রকাশক এবং সাহিত্যিক মহলে তার একটা যোগাযোগ ছিল। বিশেষ করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবী এবং সুধীন্দ্রকুমার ঠাকুরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন সুধাকান্ত।

সুধাকান্ত ছিলেন খঞ্জ। তিনি কাঠের পায়ের সাহায্যে চলাফেরা করতেন। আর সেটাই সকলের সহানুভূতি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করে তাঁকে। সাহিত্য সৃজনের তেমন ক্ষমতা না থাকলেও অভিযোগ কুম্ভীলক বৃত্তিতে ছিলেন বেশ দক্ষ। স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়িতে তিনি অনেক সময় থাকতেন। তারই সুযোগ নিয়ে একবার বঙ্কিমচন্দ্রর 'কমলাকান্তর দপ্তর'-এর একটি কাহিনি আগামুড়ো বাদ দিয়ে এমন ভাবে শোনান যে স্বর্ণকুমারী দেবী বিশেষ খেয়াল না করে সরল বিশ্বাসে সেটি 'ভারতী'-তে ছেপে দেন! পরে হেমেন্দ্র কুমার রায়কে এক চিঠিতে লেখেন, ''হেমেন্দ্র, লজ্জায় আমার মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠেছে। ...সুধাকৃষ্ণ বড়ো গুণী ছেলে। পরে সে 'জাহ্নবী'-র (নবপর্যায়) সম্পাদক হয় এবং আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি চুরি করে নিজের নামে পুস্তকাকারে ছাপিয়ে দেয়।'' (হেমেন্দ্রকুমার রায় : যাঁদের দেখেছি। পৃ. ৩৩)।

এহেন সুধাকৃষ্ণ 'জাহ্নবী'-র পুনরুত্থান ঘটান। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদনার তেমন যোগ্যতা না থাকার কারণে পত্রিকাটির দায় নিতে হয় শেষ পর্যন্ত অমল হোম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র কুমার রায় ও সুধীরচন্দ্র সরকারকে। 'জাহ্নবী'-র সম্পাদক হিসেবে এই পাঁচ জনের নাম ছাপা হতো। এ বিষয়ে সুধীরচন্দ্র সরকার লিখেছেন, 'অত অল্প বয়সে সম্পাদক হিসেবে নাম প্রকাশিত হওয়ায় আমরা খুবই গর্ব অনুভব করতাম। ...নবীন চিত্রশিল্পী হিসেবে চারু রায় তখন বেশ নাম করেছেন এই 'জাহ্নবী'-তেই ছবি এঁকে। তিনি আমাদের সম্পাদিত 'জাহ্নবী'-র প্রচ্ছদ পটটি এঁকে দেন। এই তাঁর ছবি প্রথম মুদ্রিত হলো।' (আমার কাল আমার দেশ। পৃ. ২০)।

এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, ''এই সময় আমরা তিন বন্ধুতে প্রায়ই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেও রবীন্দ্রসন্দর্শনে যেতাম। সেখানে ঋষিপ্রতিম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হলো... সুধীন্দ্রনাথ আমাদের অনুরোধ করলেন সুধাকৃষ্ণকে সাহায্য করতে। আমরা তিন বন্ধু মহোৎসাহে 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদনায় লেগে গেলাম। ...এই 'জাহ্নবী'-তেই প্রেমাঙ্কুরের প্রথম ছোটোগল্প আর হেমেন্দ্র কুমারের একখানা উপন্যাস প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে শেষপর্যন্ত সুধাকৃষ্ণর মনান্তর হয়ে গেল এবং আমরা 'জাহ্নবী' পত্রিকার পরিচালন ভার ছেড়ে দিলাম।'' (আমার জীবনে মহাস্থবির প্রেমাঙ্কুর) এরপর সুধাকৃষ্ণ আর খুব বেশিদিন 'জাহ্নবী' চালাতে পারেননি। কিন্তু জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা এবং নবীন সাহিত্যিকদের আঁতুড়ঘর হিসেবে 'জাহ্নবী' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এখনও স্বর্ণ আখরে চিহ্নিত। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

ত্রিপুরার শেষ রাজা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

ত্রিপুরার শেষ রাজা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরমাণিক্য দেববর্মণ শুধু একটি রাজপরিবারের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন না, তিনি ছিলেন ত্রিপুরার ইতিহাসে আধুনিকতার স্থপতি ও এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক। স্বল্প শাসনকাল সত্ত্বেও তিনি ত্রিপুরার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক কাঠামোয় যে সুদূরপ্রসারী রূপান্তরের সূচনা করেছিলেন, তা আজও রাজ্যের গৌরবময় স্মৃতি ও বাস্তবতার অংশ হয়ে আছে।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রায় ২৪ বছর তিনি ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করেন। এই সময়েই তিনি ত্রিপুরার শেষ সার্বভৌম ও কার্যকর রাজা হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনাধীন ত্রিপুরা ছিল ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত একটি দেশীয় রাজ্য, যার ভৌগোলিক সীমানা বিস্তৃত ছিল আজকের বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে। তখন এই অঞ্চলকে অনেক সময় 'সমতট', 'ত্রিপুরা সমভূমি' নামেও চিহ্নিত করা হতো। উত্তরে রাজন্য ত্রিপুরার সীমানা প্রসারিত ছিল বর্তমান অসমের কাছাড় অঞ্চল পর্যন্ত। কাছাড়ের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল গভীর এবং বহু সময় কাছাড় ত্রিপুরা রাজাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবাধীন ছিল। পূর্বদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত বিস্তৃত ছিল লুসাই পাহাড় (বর্তমান মিজোরাম) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত। এই পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে ত্রিপুরা রাজারা শাসন, কর আদায় ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন, যদিও শাসন পদ্ধতি ছিল অনেকাংশে উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক। দক্ষিণে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা পৌঁছেছিল বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত, বিশেষত চট্টগ্রাম উপকূল ও তার সংলগ্ন এলাকায়। বন্দর, নদীপথ ও সমুদ্রবাণিজ্যের কারণে এই দক্ষিণাঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য সেই ঐতিহাসিক রাজন্য ত্রিপুরার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে মুঘল এবং পরে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলগুলো ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পাহাড়ি অংশ নিয়েই আজকের ত্রিপুরার ভৌগোলিক রূপ গড়ে ওঠে। সংক্ষেপে বলা যায়, রাজন্য ত্রিপুরা ছিল একটি বিস্তীর্ণ, পাহাড়-সমতল-নদী-সমুদ্রসংলগ্ন ভূখণ্ডের রাজ্য, যার ভৌগোলিক অবস্থান তাকে বঙ্গোপসাগর, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন হিসেবে গড়ে তুলেছিল। বীর বিক্রম কিশোরমাণিক্য ছিলেন এই বিশাল অঞ্চলের অভিভাবক। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক ও আধুনিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী এক শাসক। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ কেবল রাজদরবার বা বংশানুক্রমিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; বরং আধুনিক শিক্ষা, পরিকল্পিত নগরায়ণ ও প্রশাসনিক সংস্কারই একটি রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেই উপলব্ধি থেকেই তাঁর শাসনামলেই আগরতলা একটি পরিকল্পিত আধুনিক নগর হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করে। প্রশস্ত সড়ক, উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে তিনি আগরতলার আধুনিক রূপের ভিত্তি স্থাপন করেন— যার ছাপ আজও নগরের রাস্তাঘাট ও পরিকাঠামোয় স্পষ্ট।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেন। নারীশিক্ষার প্রসারে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— যা তৎকালীন রক্ষণশীল রাজন্য সমাজে এক সাহসী ও প্রগতিশীল দৃষ্টান্ত। শিক্ষাই যে একটি জাতির প্রকৃত শক্তি, এই বিশ্বাস থেকেই তিনি 'মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) কলেজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যদিও তাঁর অকালমৃত্যুর কারণে এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ণতা পায়নি, তবু এর স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তিনিই। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বীর বিক্রম কিশোরমাণিক্য ছিলেন শৃঙ্খলা, ন্যায়পরায়ণতা ও আধুনিকতার প্রতীক। তিনি পুরনো প্রথাগত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক আইন-কানুন, রাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনকে গুরুত্ব দিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। তাঁর কাছে রাজনীতি ছিল ক্ষমতার প্রদর্শন নয়, বরং জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব। দুর্ভিক্ষ, মহামারী কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তিনি রাজকোষ খুলে দিয়ে প্রজাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন— যা তাঁকে একজন প্রজাবৎসল ও জনপ্রিয় শাসকে পরিণত করেছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ত্রিপুরার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তিনি সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

রাজদরবার কেবল ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল না; শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের জন্য তা ছিল সম্মানের আশ্রয়। ত্রিপুরার জনজাতিগোষ্ঠী ও ককবরক ভাষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল আন্তরিক। রাজন্য শাসনের সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির এই সমন্বয় ত্রিপুরার সমাজকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিচয় প্রদান করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক, বীর বিক্রম কিশোরমাণিক্য সেই সম্পর্ককে আরও গভীর ও মর্যাদাপূর্ণ স্তরে উন্নীত করেন। কবিগুরু তাঁকে 'ভারতভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন— যা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এক বিরল স্বীকৃতি এবং ত্রিপুরার গর্ব।

১৯৪৭ সালের ১৭ মে তাঁর অকালমৃত্যু ত্রিপুরাবাসীর জন্য ছিল এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র কিরীট বিক্রম কিশোরমাণিক্য অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রিজেন্সি কাউন্সিল পরিচালনা করেন এবং ১৯৪৯ সালে শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীনভাবে ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরার চূড়ান্ত একীভূতকরণ সম্পন্ন করেন। □

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি
দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়লো বাংলাদেশ

॥ ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ তীব্র জ্বালানি সংকটের মুখে বাংলাদেশকে রাশিয়া থেকে তেল কেনার অনুমতি দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দু'মাসের জন্য এই অনুমতি মিলেছে।

খবরটি ভুল নয়, এই প্রতিবেদকের পক্ষ থেকে কোনো ভুল তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে না। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ড. মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার গত ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র তিনদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি সই করে, তারই শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশকে এই অনুমতি নিতে হয়েছে। ভবিষ্যতে এভাবেই অনুমতি নিয়ে চলতে হবে। ইউনুস বাংলাদেশের একটি অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়ার আগে তিনি নিজ দেশের স্বার্থ এভাবেই রক্ষা করেছেন। তিনি ক্ষমতায় থাকতে এ চুক্তিতে কী ছিল তা প্রকাশ করেননি। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠনের পর প্রায় দু'মাস অতিক্রান্ত হলেও এ চুক্তি সম্পর্কে তারাও চুপ। তারাও এই চুক্তির বিষয়বস্তু প্রকাশ করেনি।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নথি থেকে সংগৃহীত হয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য থেকে এখনও পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, চুক্তিতে এই শর্তগুলো যুক্ত হয়েছে, সেগুলি হলো—

(১) বাংলাদেশ অন্য কোনো দেশ থেকে কোনো পণ্য কিনতে চাইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি লাগবে। যেসব দেশ

থেকে পণ্য কেনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আছে বা কোনো দেশের থেকে পণ্য কেনার ক্ষেত্রে যদি ভবিষ্যতে মার্কিনি নিষেধাজ্ঞা জারি হয়, তবে সেসব দেশ থেকে কোনো পণ্য কেনা যাবে না।

(২) বাংলাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাদের নির্ধারণ করা দামে ১৪টি বোয়িং বিমান কিনতে হবে। অন্য কোনো দেশের বিমান পছন্দ থাকলেও এর অন্যথা হবে না।

(৩) আগামী ১৫ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পনেরোশো কোটি ডলারের জ্বালানি কিনতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে দাম নির্ধারণ করবে সে দামেই কিনতে হবে, দরকষাকষির কোনো সুযোগ নেই।

(৪) প্রতি বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩৫০ কোটি ডলারের কৃষিপণ্য আমদানি করতে হবে। বাংলাদেশের বাজারে এই পণ্য বিক্রি হবে।

(৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় বাড়াতে হবে। বেশি বেশি অস্ত্রশস্ত্র কিনতে হবে। কিছু নির্দিষ্ট দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেনার প্রবণতা কমিয়ে আনতে হবে।

(৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোনো দেশ থেকে পারমাণবিক প্রযুক্তি বাংলাদেশ ক্রয় করতে পারবে না।

বিভিন্ন গণ-মাধ্যমে এর বাইরেও অনেক শর্তের কথা বলা হচ্ছে। তবে বর্তমান সরকার এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চুপ। কিছু বাম ধারার রাজনৈতিক দল ও অর্থনীতিবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত এই চুক্তিকে 'ভয়ংকর ফাঁদ' ও 'অভাবিতপূর্ব দাসত্ব চুক্তি' বলে আখ্যায়িত করে আলোচনা সভা, বক্তব্য, বিবৃতিতে সমালোচনা করলেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কিছুই বলা হচ্ছে না। বরঞ্চ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে যিনি এই চুক্তিতে সই করেছিলেন, সেই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও ইউনুসের তৎকালীন নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছেন। সমালোচকরা বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে বাধ্য করেছে এই পদে তাকে বসাতে, যাতে বাণিজ্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়। খলিলুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, সামান্য পরিবর্তিত নামে। এই চুক্তি সইয়ের পর তখনই তার পদত্যাগের দাবি উঠেছিল।

একটু পেছনে ফিরে দেখা যাক। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দু'দেশের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদি একটি সহযোগিতা চুক্তি সই করেছিলেন। এর অব্যবহিত পর থেকেই বাংলাদেশের চীনপন্থী রাজনৈতিক

দলগুলো এবং বুদ্ধিজীবীরা এই চুক্তিকে 'দাসত্ব চুক্তি' নামে আখ্যায়িত করে ব্যাপক সমালোচনা করেছিল, আন্দোলনও হয়েছিল। সেই চুক্তিতে অস্বস্তি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের। মুজিবকে হত্যা করার পর ঘাতক দলের প্রধান, মুজিবেরই বিশ্বস্ত খন্দকার মোশতাক ক্ষমতা গ্রহণ করার পর ধারণা করা হয়েছিল, তিনি এই চুক্তি বাতিল করবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। মোশতাক নিযুক্ত সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান তাকে সরিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর জেনারেল জিয়া প্রচণ্ড ভারতবিরোধী হিসেবে পরিচিত হন, তখন আবার দাবি ওঠে ওই চুক্তি বাতিলের। কিন্তু তিনিও সেই চুক্তি বাতিল করেননি। বাতিল করেননি এর পর ক্ষমতা দখলকারী আরেক সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদও।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বিএনপি, প্রধানমন্ত্রী হন তারই স্ত্রী খালেদা জিয়া। যথারীতি চুক্তি বাতিলের দাবি ওঠে। কিন্তু বাতিল হয়নি। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসার পর ২৫ বছর মেয়াদ শেষে স্বাভাবিক নিয়মেই চুক্তিটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

লক্ষণীয় যে, ২৫ বছরের সহযোগিতা চুক্তির অধীনে ভারত কখনো 'দাদাগিরি' দেখায়নি, বিশেষ কোনো সুবিধাও নেয়নি। বরং শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে সেনাবাহিনীর 'কয়েকজন'-এর নেতৃত্বে ঘাতক বাহিনীর হাতে নিহত ও আওয়ামি লিগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর, খন্দকার মোশতাকের সরকার ও রাজনৈতিক মহলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে, ভারত হস্তক্ষেপ করতে পারে। শেষ পর্যন্ত কোনো হস্তক্ষেপ হয়নি। তবে খন্দকার মোশতাক এক পর্যায়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনের উদ্যোগ নিলে ভারত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। তৎকালীন ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেন মুজিব হত্যাকাণ্ডের সময় নয়াদিল্লি ছিলেন। তিনি উড়ে আসেন ঢাকা, বিমানবন্দর থেকেই সরাসরি বঙ্গভবনে ছুটে গিয়ে মোশতাকের সঙ্গে দেখা করেন। তাকে অভ্যুত্থানকারী সশস্ত্র সেনা নেতাদের সামনেই হুঁশিয়ার করেন, কনফেডারেশনের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ভারত কঠোর অবস্থান নেবে। বিবিসি-র খবরে এ বিষয়ে বলা হয়েছিল, 'সমর সেনের বার্তা পেয়ে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।' কনফেডারেশন গঠনের বিষয়টি আর এগোয়নি।

২০০৯ সাল থেকে শেখ হাসিনার টানা ১৫ বছরের শাসনকালে ভারতের সঙ্গে বহু অসম ও দাসত্বমূলক চুক্তি সইয়ের অভিযোগ ওঠে। তবে তার চমৎকার জবাব পাওয়া যায় অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে। ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের 'স্থানীয় সরকার বিষয়ক উপদেষ্টা', আন্দোলনকারী ছাত্রনেতা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যে অভিযোগ করেন, ভারতের সঙ্গে শেখ হাসিনা দাসত্বমূলক যেসব চুক্তি করেছেন তার মধ্যে ১০টি চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। তার তালিকাও দেওয়া হয়। তাৎক্ষণিকভাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন সংবাদ সম্মেলন করে সহকর্মীর বক্তব্য খণ্ডন করে বলেন, যেসব চুক্তি বাতিলের কথা বলা হয়েছে, বাস্তবে এসব চুক্তির কোনো অস্তিত্বই নেই।

জানা যায়, ড. ইউনুসের দেড় বছরের শাসনকালে সরকারের ভেতরের একটি গোষ্ঠী শেখ হাসিনা কী কী 'দাসত্বমূলক' চুক্তি ভারতের সঙ্গে করেছেন তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বরং অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আদানি গোষ্ঠীর বিদ্যুৎ সরবরাহের বকেয়া টাকা পরিশোধ করা হয়। যে পাইপ লাইন বসানোর কারণে শেখ হাসিনা সমালোচিত হয়েছিলেন, সেই পাইপ লাইনে এখন ভারত থেকে জ্বালানি আসছে বাংলাদেশে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশের পাশে ছিল, ভারতীয় জওয়ানরা রক্ত দিয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিনটি 'বিজয় দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। শেখ মুজিব তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই অনুরোধ রক্ষা করে ইন্দিরা ভারতীয় সেনাদের প্রত্যাহার করে নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহু দেশে মার্কিন সেনা বাহিনী অবস্থান করছে। এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে ভারতের পদক্ষেপ বিশ্বে নজিরবিহীন। কিন্তু বিজয়ের সেই দিন থেকেই বাংলাদেশ সরকারের ভারতবিরোধিতাও নজিরবিহীন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই 'ভয়ংকর' বাণিজ্য চুক্তি সই করে বাংলাদেশ কী পেয়েছে? ইউনুস সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা গর্ব সহকারে বলেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে ১৯ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। অর্থাৎ শুল্ক কমেছে মাত্র ১ শতাংশ।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সই করা বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় বাড়াতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ যুদ্ধ করবে কার সঙ্গে? গত ৫৪ বছর ধরে বাংলাদেশ অস্ত্রশস্ত্র কিনেছে মূলত চীন ও তুরস্ক থেকে। ২৫ বছরের সহযোগিতা চুক্তি সত্ত্বেও ভারত তাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনতে বাংলাদেশকে বাধ্য করেনি। এই সাড়ে পাঁচ দশকে কোন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের যুদ্ধ হয়েছে? বাংলাদেশের স্থল সীমান্ত রয়েছে ভারত ও মায়ানমারের সঙ্গে। ভারতের সঙ্গে স্থল সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার, মায়ানমারের সঙ্গে ২৭১ কিলোমিটার। প্রথমত যদি যুদ্ধের কথা ধরে নেওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যতে যুদ্ধ হলে ভারত কিংবা মায়ানমারের সঙ্গেই হতে পারে। দ্বিতীয়ত, অস্ত্রশস্ত্র কেনার বিপুল ব্যয়ভার বাংলাদেশ কি বহন করতে পারবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে চাইছে কেন? □

নেতাজীর জীবন ভাষ্যে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সর্বোত্তম নাম নেতাজী। তিনি আপোশহীন। এই মনোভাব কীভাবে পেলেন? এই মনোভাব শুধুই কি তাঁর জন্মসূত্রে অধীত, না এর পিছনে অন্য কোনো মহামানবের প্রভাব রয়েছে? উত্তরের জন্য যাওয়া যাক কটকের র‍্যাভেন'শ কলেজিয়েট স্কুলে সুভাষচন্দ্রের এক সময়ের সতীর্থ চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর কথায়— ''সুভাষের সঙ্গে আবাল্য খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। তাই আমি জোর করে বলতে পারি যে, বিবেকানন্দের প্রভাব যদি সুভাষের উপর না পড়ত তবে সুভাষ 'সুভাষ' হতো না— 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র'কে আমরা পেতাম না।''

না, এটি অতিশয়োক্তি নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বালক সুভাষকে ভবিষ্যতের নেতাজী করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দীক্ষা দিয়েছিলেন। যদিও তাঁদের কোনোদিন দেখা হয়নি। স্বামীজীর অন্যলোকে যাত্রা ১৯০২-তে, আর সুভাষচন্দ্রের মর্ত্যাগমন ১৮৯৭-তে। সুভাষচন্দ্র যখন প্রায় পাঁচ বছরের নিতান্ত বালক তখন স্বামীজীর প্রস্থান। কিন্তু তাঁর রচনাবলী ও উদ্দীপ্ত কার্যকলাপ আজীবন সুভাষচন্দ্রকে মহত্তর জীবন ভাবনায় প্রভাবিত করেছে। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন নেতাজীর নিকটজন। তাঁর কথায় সুভাষচন্দ্রের ত্যাগ, বীরত্ব, নিজেকে নিঃশেষে দান করা, উন্নত শীর্ষ হওয়ার গুণাবলীর জন্য বিবেকানন্দের প্রভাব সর্বোচ্চ— 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনে যে স্বামীজীর খুব বেশি প্রভাব ছিল, নেতাজীর সহিত কথোপকথনে আমি তাহার বহু পরিচয় পাইয়াছি।'

সুভাষচন্দ্রের কাছে যাওয়া যাক, তাঁর মন্ত্রগুরু কে? —সেই প্রশ্নের উত্তরের জন্য। মিথ্যা তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার আগে সুভাষচন্দ্র স্বামীজী সম্পর্কে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি চিঠিতে লেখেন, 'আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন অর্থাৎ তাঁহাকে আমি নিশ্চয়ই গুরুপদে বরণ করিতাম।'

সুভাষচন্দ্র অসামান্য। ফলে নিতান্ত শৈশব থেকেই মেধা ও অন্তর্গত ভাবনায় অন্য সহপাঠীদের থেকে আলাদা। বিত্তবান শিক্ষিত পরিবারে জন্ম নেওয়া এই মেধাবী কিশোর বালক রবীন্দ্রনাথের মতোই ভাবিত হয়েছিলেন জীবন নিয়ে কী করা উচিত। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তাঁর জন্য নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক বেণীমাধব দাসের উন্নত চিন্তা, দেশপ্রেম তাঁকে প্রভাবিত করলেও নিজের মনের মধ্যে জন্ম নেওয়া সংস্কারাচ্ছন্ন প্রশ্নের সমাধানে তা যথার্থ ছিল না। এই সময় বালক সুভাষ হাতে পেলেন বিবেকানন্দ রচনাবলী। প্রেম, শৌর্য, উন্নত যাপনীয় জীবন ও আত্মমর্যাদার এক আকর গ্রন্থ বালক সুভাষ পেলেন সেখানে। তাঁর কথায় 'দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম।... বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল।' সুভাষের বয়স তখনো পনেরো অতিক্রান্ত হয়নি।

১৯১৩ সালে সুভাষচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইন্টার মিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র, তখন একদল সতীর্থ সহযোগে যেতেন দক্ষিণেশ্বর বা বেলুড় মঠে। দক্ষিণেশ্বরেই তো 'সাইক্লোনিক মঙ্ক' বিবেকানন্দের অমলিন স্মৃতি রয়েছে। আর স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ সুভাষচন্দ্রকে উদ্দীপ্ত করত। দেশের আপোশহীন বিপ্লবীদের কাছে তখন দক্ষিণেশ্বর ছিল সংগ্রামের প্রেরণাভূমি। কারণ বিবেকানন্দের ক্ষাত্রতেজ। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে যখন গ্রে স্ট্রিটের বাড়িতে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ক্রেগান গ্রেপ্তার করেন, তখন ঘর সার্চ করে পাওয়া গিয়েছিল এক 'dangerous material' কৌটায় ভর্তি দক্ষিণেশ্বরের মাটি। বিপ্লবের মাটি— স্বামীজীর তেজোদীপ্ত স্পর্শধন্য মৃত্তিকা।

সুভাষচন্দ্রের সহমর্মী মনোভাবের পশ্চাতে ছিল বিবেকানন্দের সেবার বাণী। কটকে যখন ছিলেন কলেরা বা বসন্তের মতো ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত মানুষদের সেবার জন্য 'নার্সিং ব্রাদার হুড' গড়ে তুলেছিলেন ছাত্র সুভাষ। স্বামীজী সেবাকেই অন্তর ধর্মের অংশ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। নিরন্ন অসহায় মানুষদের সেবাই হলো পূজা— 'তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? প্রথম পূজা বিরাটের পূজা... পূজা করিতে হইবে, সেবা নহে।'

স্বামীজীর সেবার জন্য এই উদাত্ত আহ্বান সুভাষচন্দ্রকে সারাজীবন প্রভাবিত করেছে। স্বামীজীর সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ কলকাতায় স্থাপন করেছিলেন একটি সেবাশ্রম। মান্দালয় জেলে বন্দি থাকার সময় একটি পত্রে সে সম্পর্কে লেখেন— ''আমি খেয়ালের বশবর্তী হইয়া সেবাশ্রমের কার্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আজ প্রায় ১২/১৪ বৎসর ধরিয়া যে গভীর বেদনা তুষানলের মতো আমাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। 'দরিদ্র নারায়ণের' সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব।''

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আদর্শ আজীবন তাঁর শক্তিমন্ত্র ছিল। আত্মশক্তি, আত্মমর্যাদা, আত্মত্যাগ ছিল সেই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি। বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল অপরিসীম শক্তি। আধ্যাত্মিক অসহযোগের ভণ্ডামি সেখানে নেই। রক্তের বিনিময়েই স্বাধীনতা আনতে হয়। মনের মধ্যে বিষাক্ত হিংসা রেখে অহিংসার ছদ্মবেশ কখনোই স্বাধীনতার মিত্র

হতে পারে না। কংগ্রেসের মিনমিনে আবেদন নিবেদন স্বামীজীকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করেছিল। এই অগ্নিময় সন্ন্যাসী তীব্র শ্লেষে বলেছিলেন— ''ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস কংগ্রেস করে মিছামিছি হইচই করছে কেন? কতকগুলো হাউড়ে লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলাবাজি করলেই কি কাজ হয়?... কেবল কি গলাবাজিতে কাজ হয়? বেপরোয়া হয়ে কাজ করতে হবে... তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক... পড়ুক গুলি আমার বুকে... কংগ্রেস জোর গলায় নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করুক, শুধু বসে বসে কাঁদুনি গাইলে কি হবে?''

এই সন্ন্যাসী তো বঙ্কিমচন্দ্রে 'আনন্দমঠ'-এর বিদ্রোহী সন্ন্যাসী। স্বামীজীর এমন বাণী সুভাষচন্দ্রকে বিপুল ভাবে প্রভাবিত করেছিল। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ এই ভালোবাসা তো নেতাজীকে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে সাহায্য করেছিল। সুভাষচন্দ্র তাই উচ্চারণ করেছিলেন 'অভীঃ' মন্ত্রে প্রভাবিত হয়ে— ''There is nothing that lures me more than a life of adventure away from the beaten track and in search of the unknown to this path I call my countryman.'' স্বামী বিবেকানন্দ প্রাজ্ঞ, অনন্ত জ্ঞানের সমুদ্র রাশি। জ্বলন্ত সূর্যের সৃষ্টিশীল রশ্মির মতো তাঁর বিবেকী অনুভূতির তীব্রতা। তিনি আধুনিক, বৈশ্বিক, সর্বজাতিক। আবার একই সঙ্গে সচেতন সনাতন। ভারতীয় ঐতিহ্য পুষ্ট। বাস্তববাদী। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও মুক্ত পৃথিবীর কথা ভাবতেন। তাঁর কথায় 'ঘরের... সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা।' কিন্তু তাতে যেন আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের 'রত্নরাজি' ভেসে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন। তাঁর মন্ত্রশিষ্য সুভাষচন্দ্র তো এক্ষেত্রে একেবারেই স্বামীজী ভাবিত। সুভাষচন্দ্র বলিষ্ঠ। চোগা চাপকান পরা শখের রাজনীতিক হয়ে ভারত সন্ধানে যান না। তাঁর স্পষ্ট অভিমত একেবারে বিবেকানন্দ প্রদর্শিত 'আমাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে আধুনিককালে এবং আধুনিক পরিবেশে।... আমাদের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে আমরা একটি নতুন ও আধুনিক জাতি গড়ে তুলতে চাই।'

বিবেকানন্দ সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত হয়েছেন তাঁর রচনাবলী পড়ে। স্বামীজীর কীর্তিগাথাকে উপলব্ধি করে। তাই বিবেকানন্দের আলোচনায় তিনি অন্তহীন, উচ্ছ্বসিত, প্রাণবন্ত। শ্রদ্ধাবনত। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, ''ত্যাগে বেহিসাবি, কর্মে মহাপুরুষের বিষয়ে কিছুই বলা হবে না। এমনই ছিলেন তিনি মহৎ, এমনই ছিল চরিত্র— যেমন মহান তেমনই জটিল। আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণেই আশ্রয় নিতাম।''

স্বামীজী প্রভাবিত সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাসধর্মের প্রতি গভীর এক আকর্ষণ বোধ করতেন। ১৯১৩-তে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে হুগলী নদীর তীরে শান্তিপুরে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাসী হয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে ছিলেন। এই সন্ন্যাস ব্রত শুধু ভক্তিমার্গের জন্য নয়। তিনি তো আত্মমুক্তি চাননি। তাঁর প্রিয় মহামানব স্বামীজীও তো জগতের কল্যাণ চেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় নরেনকে বলেছিলেন বটবৃক্ষের মতো হয়ে বহুলোকের আশ্রয়স্থল হতে, নরেন স্বামী বিবেকানন্দে উন্নীত হয়ে তাই করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র তো ছাত্রাবস্থা থেকেই অশক্তের আশ্রয়। দেশনায়ক নেতাজী হয়ে তিনি মুক্তিকামী মানুষদের বিশ্বাস ও শক্তির বটবৃক্ষ। উচ্চশিক্ষিত সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর নির্দেশিত দেশজননীর মুক্তির জন্য সর্বত্যাগী। রোগাক্রান্ত মানুষের পাশে যেমন থাকেন, তেমনি ভীম রণভূমেও স্থিতধী। জাগতিক ভীতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। স্বামীজী সন্ন্যাসী হয়েও নিছক আধ্যাত্মিক মার্গে অবস্থান করেননি। এ দেশের সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, স্বাধীনতা সবই ছিল তাঁর সাধনা ক্ষেত্র। জামশেদজী টাটাকে বলেছিলেন বিদেশি প্রযুক্তির সাহায্যে এদেশে কারখানা করতে। সুভাষচন্দ্র চাইতেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অর্থনীতিতে আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর কারখানা বড়ো ভূমিকা রাখুক। গান্ধী কলকারখানা বর্জিত কুটীর শিল্প চাইতেন— যদিও শিল্পপতি ঘনশ্যাম দাস বিড়লার আতিথ্য নিতে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। সুভাষচন্দ্র মোহমুক্ত ভাবে বিশ্ব অর্থনীতি পর্যবেক্ষণ করে আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর কারখানা ও কৃষিক্ষেত্রে শক্তিশালী ভারতই চাইতেন।

সুভাষচন্দ্রের সময় নারীশক্তি আলোচিত কিন্তু সম্যকভাবে স্বাগত নয়। কিছু বিক্ষিপ্ত ক্ষেত্র ছাড়া নারীরা ছিলেন মূলত অবরোধের আড়ালে। স্বামী বিবেকানন্দ তো মুক্ত দৃষ্টির ছিলেন। পশ্চিম বিশ্ব পরিভ্রমণ তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে আরও তীক্ষ্ণ করেছে। কেলতিক রমণী এলিজাবেথ নোবেলকে স্বামীজী ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এদেশের অবরুদ্ধ নারী জাতির মুক্তির জন্য। ভগিনী নিবেদিতা নারী মুক্তির জন্য বিলেতের আরামপ্রদ জীবনকে তুচ্ছ করে এদেশে এসেছেন। আবার বীরত্বের জন্য ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈকে স্বামীজী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। নারীজাতির প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা সুভাষচন্দ্রেও সগৌরবে বর্তমান। আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিল ঝাঁসীর রানি ব্রিগেড। শক্তিমান নারী বাহিনী তৈরিতে স্বামীজীর প্রভাব ছিল নিঃসন্দেহে। নিবেদিতার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Master as I saw Him' ছিল নেতাজীর পছন্দের একটি গ্রন্থ যার থেকে প্রায়শই তিনি নানা উদ্ধৃতি দিতেন।

আমাদের দেশে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের মতো। উপনিষদে বলা হয়েছে, ''যদৈবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্যথৈভিরের প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি/এবংবিৎ যদা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি/তথ সঃ এভিঃ এব প্রাণৈঃ সহ পুত্রম আবিশতি।'' অর্থাৎ পিতার মৃত্যুকাল সমাসন্ন হলে নব্য বস্ত্র, মাল্য পরিহিত হয়ে পুত্র পিতার সামনে আসেন, তাঁর ইন্দ্রিয় স্পর্শ করেন। পিতা তখন বাক্, মন ও প্রাণ দিয়ে পুত্রের অনুপ্রবিষ্ট হন। পিতার সদ্‌গুণাবলী এভাবে পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। কথাগুলো এজন্যই বলা, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের গুরু। তিনি প্রথাগত ভাবে বিবেকানন্দের দ্বারা দীক্ষিত ছিলেন না, ছিলেন মানস দীক্ষিত। বিবেকানন্দের তেজোদীপ্ত কার্যকলাপ সুভাষচন্দ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। স্বামীজীর কালীমায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নেতাজীতে সগৌরবে অনুপ্রবিষ্ট। তিনিও ছিলেন শক্তিদেবী কালীর উপাসক। একই সঙ্গে স্বাধীনতাকামী বিবেকানন্দের মুক্ত চিন্তা, নারী মুক্তির আহ্বান, ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বাস্তব মনোভাব সুভাষচন্দ্রে পরিদৃশ্যমান। সুভাষচন্দ্রের মানস গঠনে বিবেকানন্দের সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গী অতি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।

স্বামীজীর দিব্যরূপ সুভাষচন্দ্রে প্রতিফলিত হয়ে তাঁকে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত এক অলৌকিক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সত্তা সুভাষচন্দ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে চিরদিনের দেশনায়ক করেছে। স্বামীজীর গেরুয়া বসন মানস অঙ্গে ধারণ করে রাজনীতির সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হতে পেরেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। □

ব্যাডমিন্টনের বিশ্বমঞ্চে নতুন ভূমিকায় পিভি সিন্ধু

নিলয় সামন্ত

সম্প্রতি ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায় যুক্ত হলো। দেশের অন্যতম সফল শাটলার পিভি সিন্ধু এবার আন্তর্জাতিক প্রশাসনিক পরিসরেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের অ্যাথলিটস কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর সংস্থার কাউন্সিল সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সক্রিয় ও শীর্ষস্থানীয় কোনো খেলোয়াড়ের এভাবে বিশ্ব ক্রীড়া প্রশাসনের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আসা বিরল ঘটনা বলেই মনে করছেন ক্রীড়া মহল।

ডিসেম্বর দু' হাজার পঁচিশে এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়। সিন্ধু এই পদে আসীন হয়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন গ্রেশিয়া পোলির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। পোলি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে সরে যাওয়ার পর ২০২২ সালে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সিন্ধু এখন ২০২৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকবেন বলে জানা গেছে।

ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের কাউন্সিল হলো সংস্থার সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মঞ্চ। এই কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে সিন্ধুর ভূমিকা নিছক প্রতীকী নয়, বরং তা কার্যত নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। বাজেট অনুমোদন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, প্রতিযোগিতার কাঠামো এবং বিশ্বজুড়ে ব্যাডমিন্টনের প্রসারের রূপরেখা নির্ধারণ— সব ক্ষেত্রেই কাউন্সিলের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। ফলে একজন বর্তমান খেলোয়াড় হিসেবে সিন্ধুর উপস্থিতি খেলোয়াড়দের দৃষ্টিভঙ্গিকে সরাসরি নীতিনির্ধারণে প্রতিফলিত করার সুযোগ তৈরি করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এই পদে আসীন হয়ে সিন্ধু নিজেও গর্ব প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, এটি শুধু ব্যক্তিগত সম্মান নয়, বরং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের খেলোয়াড়দের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার একটি বড়ো দায়িত্ব। আধুনিক ক্রীড়াজগতে খেলোয়াড়দের অধিকার, মানসিক স্বাস্থ্য, সময়সূচির ভারসাম্য এবং আর্থিক নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলি ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে। সেই প্রেক্ষিতে অ্যাথলিটস কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সিন্ধুর মতো একজন সক্রিয় খেলোয়াড় এই দায়িত্বে থাকায় বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও কার্যকর হতে পারে।

২০২৬ সালের শুরুতেই ডেনমার্কের হর্সেন্স শহরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় সিন্ধু প্রথমবার কাউন্সিল সদস্য হিসেবে যোগ দেন। ওই সভাতেই নতুন তিন গেমের পনেরো পয়েন্টের স্কোরিং ফরম্যাট অনুমোদিত হয়, যা ভবিষ্যতে ব্যাডমিন্টনের গতিপ্রকৃতিতে বড়ো পরিবর্তন আনতে পারে। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করে সিন্ধু ইতিমধ্যেই তাঁর প্রশাসনিক ভূমিকার সূচনা করেছেন।

ভারতের ক্রীড়া প্রশাসনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংযোগের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর আগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী এবং ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সভাপতি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত এই কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তবে সিন্ধুর ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও ব্যতিক্রমী, কারণ তিনি এখনও সক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন এবং বিশ্বের শীর্ষ খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম।

ক্রীড়াজীবনে সিন্ধু নিজেই এক অনুপ্রেরণার গল্প। অলিম্পিক পদক, বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্য এবং দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাঁকে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের অন্যতম মুখ করে তুলেছে। সেই অভিজ্ঞতাই এখন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে কাজে লাগবে বলে আশা করা হচ্ছে। খেলোয়াড় হিসেবে তিনি যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়েছেন, সেগুলির সমাধানে তিনি আরও সংবেদনশীল ও কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবেন। আধুনিক ক্রীড়াজগতে খেলোয়াড়দের প্রশাসনে অন্তর্ভুক্তির প্রবণতা বাড়ছে। ফুটবল, টেনিস বা অ্যাথলেটিক্স— সব ক্ষেত্রেই প্রাক্তন বা বর্তমান খেলোড়দের প্রশাসনিক ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে এবং ক্রীড়াব্যবস্থার উন্নয়ন আরও সুসংহত হয়। সিন্ধুর এই পদলাভ সেই ধারাকেই আরও শক্তিশালী করল।

ভারতীয় ক্রীড়ার দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি এক বড়ো সাফল্য। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব শুধু খেলায় নয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ক্রমশ বাড়ছে। সিন্ধুর এই দায়িত্ব ভবিষ্যতে আরও ভারতীয় খেলোয়াড়কে এমন ভূমিকা নেওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, পিভি সিন্ধুর এই নতুন দায়িত্ব কেবল তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের জন্য এক গর্বের মুহূর্ত। খেলোয়াড় থেকে নীতিনির্ধারক— এই রূপান্তর তাঁর বহুমাত্রিক দক্ষতারই প্রমাণ। আগামীদিনে তিনি কীভাবে এই দায়িত্ব সামলান এবং বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের ভবিষ্যৎ গঠনে কী ভূমিকা নেন, সেদিকেই এখন নজর ক্রীড়াপ্রেমীদের। □

নবাঙ্কুর

মানবতার সন্ধানে

ঝড় থেমে যাওয়ার পর নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিল অর্ণব। আকাশে তখনও মেঘের ঘনঘটা। কিন্তু বাতাসে এক অদ্ভুত শান্তি। অর্ণব গ্রামের ছেলে। শিশুকাল থেকেই তার নদীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক।

কিন্তু আজকের দিনটা একেবারে আলাদা। আজ সে এক অভিযানে বেরিয়েছে।

অর্ণব শুনেছে গ্রামের পাশের জঙ্গলে এক বৃদ্ধ মানুষ থাকেন, যিনি বহু বছর ধরে সেখানে একা জীবন কাটাচ্ছেন। কেউ তাঁর খোঁজখবর রাখে না। কেউ তাঁর কাছে যায় না। কোনো অজানা কারণে সবাই তাঁকে ভয় পায়। অর্ণব মনস্থির করেছে, সে একাই যাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

জঙ্গলের পথ সহজ নয়। কাঁটাঝোপে ভরা। পিচ্ছিল মাটি আর বিচিত্র শব্দে ভরা চারপাশ। একটুকুও ভয় না পেয়ে অর্ণব এগিয়ে চলল। অবশেষে সে একটি কুঁড়েঘর দেখতে পেল। দরজার সামনেই বসেছিলেন সেই বৃদ্ধ। চুল,দাড়ি-গোঁফে ভর্তি মাথা ও মুখমণ্ডল। শুধু চোখদুটি দেখা যাচ্ছে।

একটুও ভয় না পেয়ে এগিয়ে এল অর্ণব। বলল— দাদু, আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। বৃদ্ধ অবাক চোখে তাকালেন। অনেকদিন পর কেউ তাঁর কাছে এসেছে।

ধীরে ধীরে তাদের কথা শুরু হলো। বৃদ্ধ জানালেন, একসময় তাঁর ভরা পরিবার ছিল। তিনি শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু এক ভয়ানক দুর্ঘটনায় সবাইকে তিনি হারিয়েছেন। সেই কষ্টে তিনি নিজেকে সবার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এই জঙ্গলে বাস করছেন।

অর্ণব মন দিয়ে সব শুনলো। তারপর বলল— দাদু, আপনি এখন থেকে আর একা নন। আর আপনাকে একা থাকতে হবে না। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। এই কথা শুনে বৃদ্ধের চোখে জল এসে গেল। তারপর সেই বৃদ্ধকে নিয়ে অর্ণব ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে রওনা হলো।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। বৃদ্ধ অর্ণবদের বাড়িতে থাকলেও তিনি এখন পাড়ার দাদু। সারা পাড়ার ছেলে-মেয়েরা দাদুর কাছে পড়তে আসে। ছুটির দিনে দাদুর ঘরে ছোটোদের গল্পের আসর বসে। বড়োরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করে। বৃদ্ধ যেন পরিবার, সবকিছু ফিরে পেয়েছেন।

বাস্তবে, অর্ণব সেদিন শুধু একটি সাধারণ অভিযানে যায়নি। সে একজন মানুষের হৃদয়ে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তার ছোট্টো বয়সের সাহস আর মানবিকতা প্রমাণ করেছে, সতিকারের অভিযান শুধু পাহাড় আর জঙ্গল জয় নয় — মানুষের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার মন জয় করাই সবচেয়ে বড়ো অভিযান।

দেবরাজ মেহতা, নবমশ্রেণী,
পার্কসার্কাস, কলকাতা-১৭।

জাতীয় উদ্যান

মুরলেন

মুরলেন জাতীয় উদ্যান মিজোরাম রাজ্যের চাম্ফাই জেলায় মায়ানমার সীমান্তের কাছে চীন পাহাড় সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। ১৯৯১ সালে এটি জাতীয় উদ্যান রূপে ঘোষিত হয়। এর আয়তন ১০০ বর্গকিলোমিটার। এই উদ্যানে ১৫০-রও বেশি প্রজাতির পাখি এবং ৪০০-রও বেশি রকমের ভেষজ গাছপালা রয়েছে। বন্য জন্তুর মধ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, হিমালয়ান কালো ভালুক এবং বিভিন্ন প্রজাতির বাঁদর রয়েছে। এই উদ্যানের ভেতরের অংশ এতই ঘন যে দিনের বেলা ১ শতাংশ সূর্যালোক মাটিতে পড়ে। অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস এই উদ্যান পরিদর্শনের উপযুক্ত সময়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১১১

কিমর্থম্ দ্বারা প্রশ্ন
(**কীজন্য** দিয়ে প্রশ্ন)

অভ্যাস কুর্ম: –

লতা কিমর্থম্ বিপণীং গচ্ছতি?
লতা কীজন্য দোকানে যায়?
গণেশ: কিমর্থং পঠতি?
গণেশ কীজন্য পড়াশোনা করে?
আরক্ষক: কিমর্থম্ আগচ্ছতি?
পুলিশ কীজন্য আসে?
শ্রেয়া কিমর্থং মন্দিরং গচ্ছতি?
শ্রেয়া কীজন্য মন্দিরে যায়?
সুনীল: কিমর্থং গীতং গায়তি?
সুনীল কীজন্য গান গায়?

প্রযোগং কুর্ম: --

অধ: দ্বারা বাক্যাণি রচয়াম
(**অধঃ** দ্বারা কয়েকটি বাক্য রচনা করবো)

ভালো কথা

টুনটুনির বাসা

আমাদের বাড়ির সোলার রুমে সোলারের উপরে দুটো টুনটুনি পাখি বাসা বেঁধেছে। কী সুন্দর বাসাটি আর ছোট্টো। সেটার একটি দরজা আছে। পাখিদুটো সেই দরজা দিয়ে ভেতরে যাওয়া-আসা করে। বাসায় তিনটে ডিম পেড়েছিল। সেই ডিম ফুটে তিনটে ছানা হয়েছে। ছানাগুলো চিঁ চিঁ করে ডাকে। ওদের বাবা-মা সারাদিন মুখে করে খাবার এনে খাইয়ে দেয়। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আর আমার খুব আনন্দ হয়।

পৃথা বেরা, প্রথমশ্রেণী, রাজরাজেশ্বরপুর, পাথরপ্রতিমা, দঃ ২৪ পরগনা

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ল ট কূ কৌ	(১) শ টা কু ড়ো প ম
(২) ল ণ্ঠ ক কো	(২) রো পু হি কু ত ল

২৭ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর
(১) পাতাবাহার (২) পাহারাদার

২৭ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর
(১) পদ্মবিভূষণ (২) পরমপুরুষ

(১) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯ (২) হৃতিকা মণ্ডল, জয়শ্রী, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০। (৩) নীলাক্ষ পাণিগ্রাহী, সোনারপুর, দ: ২৪ পরগনা। (৪) পূজা সরদার, ক্যানিং, দ: ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

‘মে দিবস’-এর প্রোপাগান্ডা মার্ক্সবাদের নৃশংস স্বরূপ ঢাকতে চায়

পিন্টু সান্যাল

মার্ক্সবাদ তথা কমিউনিজম শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার তত্ত্ব আউরে থাকে কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসে এই তত্ত্ব সবচেয়ে বড়ো স্ববিরোধিতার প্রমাণ। একদিকে এটি শ্রমিকের অধিকার রক্ষার মহান ব্রত প্রচারের জন্য ‘মে দিবস’ পালন করে, অন্যদিকে ইতিহাসের পাতায় এই মতাদর্শেরই অধীনে তৈরি ‘গুলাগ’ (Gulag)-নামক শ্রমশিবিরে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের আর্তনাদ জমা হয়ে আছে। এই পরস্পর বিরোধিতা কেবল রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশ নয়, বরং এটি একটি আদর্শের মূলে থাকা ত্রুটি ও মানবিকতা দলনের দলিল।

১৮৮৬ সালে শিকাগোর হে-মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিকদের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের স্মরণে পালন করা হয় ১ মে। ১৮৮৬ সালের ১ মে শ্রমিকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মূল দাবি ছিল আট ঘণ্টা কাজের সময়সীমা। কোনো কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব তখনও অনেক দূরে! আর এই শ্রমিক আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল মার্ক্সবাদের লক্ষ্যের থেকে আলাদা।

মার্ক্সবাদের মূল লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদ ধ্বংস করে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু মে দিবসের সূচনালগ্নে শিকাগোর শ্রমিকদের মূল দাবি ছিল অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং তা অর্থনৈতিক—‘দিনে আট ঘণ্টা কাজ’। এটি কোনো রাজনৈতিক বিপ্লব ছিল না, বরং বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে শ্রম সংস্কারের একটি লড়াই ছিল।

মে দিবসকে একটি ‘আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ‘দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল’ (Second International)- এর সম্মেলনে। এই সম্মেলনে মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রীরা আধিপত্য বিস্তার করেন। ফরাসি প্রতিনিধি রেমন্ড লাভিন শিকাগোর ঘটনার স্মরণে ১৮৯০ সাল থেকে ১ মে আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিক দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। এখান থেকেই মূলত বামপন্থীরা এই দিনটিকে তাদের দলীয় মতাদর্শ প্রচারের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা শুরু করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন-সহ সকল কমিউনিস্ট দেশে মে দিবস পালন করা হতো বিশাল সামরিক কুচকাওয়াজ এবং রঙিন শোভাযাত্রার মাধ্যমে। স্লোগান দেওয়া হতো ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’।

‘মে দিবস’-এর উল্লাসের সমান্তরালে সোভিয়েত ইউনিয়নে এক অন্ধকার অধ্যায় ছিল ‘গুলাগ’। জোসেফ স্তালিনের শাসনামলে এটি চূড়ান্ত রূপ নেয়। এটি ছিল একটি সরকারি সংস্থা যা বাধ্যতামূলক শ্রমশিবির পরিচালনা করতো।

যে কমিউনিস্ট শাসন শ্রমিকের অধিকারের কথা বলে, তারাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে (যাদের বড়ো অংশই ছিল সাধারণ শ্রমিক ও কৃষক) ‘জনগণের শত্রু’ তকমা দিয়ে পাঠিয়ে দিত এই শিবিরে।

মার্ক্সবাদের 'Theories of Surplus Value’ বলে যে, শ্রমিকের শ্রমের ফলে উৎপন্ন লভ্যাংশ, পুঁজিবাদীর পুঁজির রূপ নেয় আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা লভ্যাংশ বৃদ্ধির জন্য শ্রমিককে নিরন্তর শোষণ করতে থাকে। ‘সর্বহারার একনায়কত্ব’ নাম নিয়ে যে তন্ত্র বা বলা ভালো যে, ‘একনায়ক’ সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করলো তারা অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হওয়ার জন্য কৃষক-শ্রমিককে ভরপেট খাওয়া, পর্যাপ্ত ঘুম, স্বাভাবিক বাসস্থান, স্বাধীন জীবন পর্যন্ত দেয়নি; লভ্যাংশের অধিকার সেখানে কল্পনার বাইরে! যেখানে ‘একনায়কত্ব’ থাকে, সেখানে ভুল ধরিয়ে দেওয়া প্রাণদণ্ড পাওয়ার মতো অপরাধ।

মার্ক্স যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমালোচনা করে তা থেকে মুক্তির উপায় বলেছিলেন বলে মার্ক্সবাদীরা দাবি করে, তা দিয়ে শ্রমিকের মুক্তি তো ঘটেইনি বরং পুঁজিপতির জায়গা নিয়েছিল একটা গোটা দেশের শাসনব্যবস্থা। মানুষকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক চাহিদা সম্পন্ন জীব হিসেবে দেখা কমিউনিজমের ধ্বজবাহকরা, সোভিয়েত রাশিয়ায় নির্মাণ করেছিল বিশ্বের ইতিহাসের সবথেকে বড়ো শ্রম-কারাগার।

‘গুলাগ’ এই শব্দটির মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসকদের নৃশংসতা আর কমিউনিজমের ব্যর্থতা লুকিয়ে আছে। প্রতিবিপ্লবী, দেশদ্রোহী, গুপ্তচর, নাশকতায় অভিযুক্ত ও রাজনৈতিক বন্দিদের গুলাগের শ্রমশিবিরে অমানবিক পরিস্থিতিতে জোরপূর্বক কাজ করানো হতো। জার্মানিতে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের আবির্ভাবের অনেক আগেই সোভিয়েত রাশিয়াতে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের প্রয়োগ শুরু হয়। লেনিনের আমলেই গুলাগ তৈরি হয় আর স্তালিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গুলাগ ক্যাম্পের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

বিভিন্ন দেশে বামপন্থী দলগুলো স্তালিনের ছবিকে সামনে রেখে শ্রমিকদের অধিকারের জন্য মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও মানবাধিকারের কথা বলে। কারণ তারা জানে ‘গুলাগ’-এর ইতিহাস রাজনৈতিক আলোচনা ও ইতিহাস পাঠক্রমে জায়গা পায়নি বলে সাধারণ মানুষ এই নৃশংসতার ইতিহাস জানে না। মার্ক্সবাদ সমাজকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষক ও শোষিত হিসেবে ভাগ করে। আর শোষিতের অধিকার আদায়ের জন্য ‘Dictatorship of Proletariat’ অর্থাৎ ‘সর্বহারার একনায়কত্ব’ প্রতিষ্ঠার কথা বলে। কিন্তু একবার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, সেই তন্ত্র যে শোষকের জায়গা দখল করবে না এর কোনো নিশ্চয়তা ও যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ মার্ক্সবাদ দেয়

ফঃ ৬

না। বরং সোভিয়েত রাশিয়া প্রমাণ করেছে যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রমিকের অধিকার দূরের কথা, মানবিক অধিকার পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকে না। আবার যখন স্বৈরাচারী একনায়ক ক্ষমতা দখল করে তখন শুধুমাত্র ক্ষমতা দখল করে রাখার তাগিদে ও নিজের ব্যক্তিগত মত প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিজমের সমর্থক ও তার সহযোগীদের হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। এমনকী একই লক্ষ্যপূর্তির জন্য সর্বাধিনায়কের থেকে ভিন্ন মত পোষণের জন্য প্রাণ হারানোর উদাহরণ সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রচুর আছে। মার্ক্সবাদ অনুযায়ী সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিশেষ শ্রেণীকে 'শ্রেণী শত্রু' বলে তাদের নিশ্চিহ্ন করার প্রক্রিয়া জারের পতনের পর থেকেই চলতে থাকে।

সর্বাধিনায়কের বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হলেই তাকে 'শ্রেণী শত্রু' তকমা দিয়ে দিলে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার অধিকার একনায়কতন্ত্র দেয় না অর্থাৎ আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো জায়গা থাকে না।

সোভিয়েত রাশিয়ায় শিল্পায়নের গতি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। গুলাগের শ্রমশিবিরের মাধ্যমে স্তালিন সেই প্রয়োজন মিটিয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল সোভিয়েত রাশিয়াকে দরিদ্র, দুর্বল, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে একটি শিল্পশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। স্তালিনের ধারণা ছিল কৃষি সমষ্টীকরণের মাধ্যমে যে অর্থাগম হবে তা দিয়ে শিল্পের উন্নতি হবে। যে মার্ক্সবাদ— পুঁজিবাদকে শোষণের যন্ত্র বলেছে সেই মার্ক্সবাদকে সামনে রেখে একজন 'একনায়ক' গোটা দেশকেই আপন লক্ষ্যপূর্তি এবং বড়ো পুঁজি সৃষ্টির জন্য কৃষির সমষ্টীকরণ ও বিনামূল্যে বিশাল শ্রমিক বাহিনী পাওয়ার জন্য গুলাগ নামের শ্রম-কারাগার সৃষ্টি করেছিল।

১৯১৭ সালের তথাকথিত নভেম্বর বিপ্লবের পর, লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকারের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে ফেলিক্স এডমুন্ডোভিচ ডজার্জিনস্কি (Felix Edmundovich Dzerzhinsky)।

ডজার্জিনস্কির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো GPU (গোসুদারস্টভেনোয়ে পোলিতিচেস্কোয়ে উপ্রাভলেনিয়ে) বা রাজ্য রাজনৈতিক প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা। তবে GPU-এর পূর্বসূরি ছিল চেকা (All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution and Sabotage), যা ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। চেকা ছিল রাশিয়ান বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি গোপন পুলিশ সংস্থা, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লব-বিরোধীদের দমন করা এবং সোভিয়েত সরকারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। ডজার্জিনস্কি চেকা-র প্রধান হিসেবে ১৯১৭ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

১৯২২ সালে, চেকাকে বিলুপ্ত করে GPU গঠন করা হয়। এটি মূলত চেকা-র কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ছিল, তবে এর কাঠামো ও কার্যক্রম কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছিল। GPU ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের গোপন পুলিশ সংস্থা যা পরবর্তীতে NKVD এবং KGB-র মতো সংস্থার পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত হয়। এর প্রধান কাজ ছিল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, শত্রুদের দমন করা এবং সোভিয়েত রাজনীতির বিরোধীদের নির্মূল করা। GPU কার্যক্রমের অধীনে বিপ্লব-বিরোধী বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো, যার মধ্যে গ্রেপ্তার, নির্বাসন, এমনকী মৃত্যুদণ্ডও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

GPU-এর সর্বাধিনায়ক Dzerzhinsky, তার উত্তরসূরী Genrikh Yagoda-কে ৪ মে, ১৯২৬ সালে লেখা এক চিঠি থেকে শ্রমশিবিরের পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায়—"Do you not think that the GPU should set up a special penal colony unit– which could be financed with a special fund from the money confiscated? We could resettle all of these parasites in our most distant and inhospitable regions– in accordance with a pre-established governmental plan."

১৯২২ সালে সলেভটস্কি দ্বীপপুঞ্জের পাঁচটি দ্বীপে প্রথম বন্দিশিবির তৈরি করা হয়। রাশিয়ার অর্থোডক্স খ্রিস্টীয় মনাস্টারিগুলির মধ্যে বৃহত্তমটি ছিল এই দ্বীপে। মনাস্টারি থেকে পাদরিদের বের করে 'গুলাগ' ক্যাম্পের সূচনা হয় এখানে।

রাজনৈতিক বন্দি, জারবাদী সেনাবাহিনীর প্রবীণ অফিসার ও খ্রিস্টান যাজকদের এই শ্রমশিবিরে বন্দিদশায় কাটাতে হতো। বন্দিদের মধ্যে যারা সুনজরে থাকতো তারা বন্দি শিবিরের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকতো। সলেভটস্কির বন্দি শিবিরের সাজাপ্রাপ্ত ভারলাম শালামভের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, বন্দিরা নিজেরাই নিজেদের দু'হাত পিছনে বেঁধে রাখার অনুরোধ করতো যাতে পালানোর অভিযোগে তাদের প্রাণ হারাতে না হয়। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দিশিবিরে বন্দির সংখ্যা বাড়ানোর চাহিদা বাড়তে থাকলো। সলেভটস্কির এই পরীক্ষামূলক বন্দিশিবির পরবর্তীকালের 'গুলাগ' শ্রমশিবির বা লেবার ক্যাম্পের সূচনা হিসেবে ধরা যায়।

লেনিনের 'War communism'-এর সময় কৃষকদের থেকে জোরপূর্বক উৎপাদিত খাদ্যশস্য কেড়ে নেওয়ার ফলে সমস্ত সোভিয়েত রাশিয়া জুড়ে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

নোবেলজয়ী রাশিয়ান সাহিত্যিক আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিন-এর আত্মজীবনী 'The Gulag Archipelago'-তে গুলাগের বিভীষিকাময় চিত্র তুলে বলেছেন লেনিনের আমলেই এই শ্রম কারাগার তৈরির পরিকল্পনা হয় আর সেই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবেই মার্ক্সবাদের গর্ভজাত— 'মার্ক্স ও এঙ্গেলস কি শিখিয়ে যাননি যে, পুরনো বুর্জোয়া দমন-পীড়ন যন্ত্রকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে অবিলম্বে সেখানে একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে? আর সেই দমন-পীড়ন যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল— সেনাবাহিনী (আমরা অবাক হই না যে ১৯১৮ সালের শুরুতেই রেড আর্মি বা লাল ফৌজ গঠিত হয়েছিল); পুলিশ (মিলিশিয়া বাহিনী তো সেনাবাহিনীর চাইতেও আগে চালু করা হয়েছিল); আদালত (২২ নভেম্বর, ১৯১৭ থেকে); এবং কারাগার। সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় তারা একটি নতুন ধরনের কারাগার তৈরিতে দেরি করেন কী করে?'

অর্থাৎ, কারাগারের বিষয়টি, সেটি পুরনো হোক বা নতুন, তাতে

দেরি করা একেবারেই অনুমতির যোগ্য ছিল না। নভেম্বর বিপ্লবের পরবর্তী প্রথম মাসগুলোতেই লেনিন ইতিমধ্যে 'শৃঙ্খলা জোরদার করার জন্য সবচাইতে কঠোর ও ড্রাকোনিয়ান (অতি কঠোর) ব্যবস্থার' দাবি জানাচ্ছিলেন। আর কারাগার ছাড়া কি এমন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব?

এই ক্ষেত্রে সর্বহারা দেশ নতুন কী অবদান রাখতে পারত? লেনিন নতুন পথ খুঁজছিলেন। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি বিবেচনার জন্য একগুচ্ছ শাস্তির পরামর্শ দিয়েছিলেন— যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা... কারাবাস, ফ্রন্টে (যুদ্ধক্ষেত্রে) প্রেরণ এবং যারা বিদ্যমান আইন অমান্য করবে তাদের সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রমদান। ''এভাবেই আমরা লক্ষ্য করি যে, 'আর্কিপেলাগো' বা দ্বীপপুঞ্জের প্রধান ধারণা; 'বাধ্যতামূলক শ্রম'; অক্টোবর বিপ্লবের এক মাসের মধ্যেই সামনে আনা হয়েছিল।''—লেনিনের আমলে শুরু হওয়া মার্ক্সবাদের এই প্রয়োগ স্তালিনের আমলে চরমতম রূপ পায়।

স্তালিন নিজের পার্টির রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দেওয়ার পর 'চিরশত্রু' কৃষকদের দিকে মুখ ফেরায়। ১৯২৮ সালে উৎপাদনের তুলনায় কৃষকদের থেকে খাদ্যশস্য কম সংগ্রহ হয়। সংগ্রাহক সংস্থাগুলোর অব্যবস্থা, কমিউনিস্ট দেশ দ্বারা নির্ধারিত তুলনামূলক কম বিনিময় মূল্য 'কুলাক'দের (রাশিয়ার কৃষক শ্রেণী) থেকে সরকারের খাদ্যশস্য কম সংগ্রহের কারণ। স্তালিন একে 'কুলাক বিদ্রোহ' হিসেবেই দেখেছিল। সশস্ত্র কমিউনিস্টদের গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে উদ্বৃত্ত লুকানো শস্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয় আর শাস্তিস্বরূপ বাজার মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ দামে শস্য সংগ্রহ করা হয়; সংগ্রহের পরিমাণ দ্বিগুণ, তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কৃষকরা পরবর্তী বছরে বীজ রোপণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। স্তালিন কুলাকদের থেকে পরিত্রাণ পেতে দৈত্যাকার যৌথ খামার ব্যবস্থার প্রচলনের সিদ্ধান্ত নেয়। GPU কাঠ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য আরও বেশি বন্দির দাবি করে। সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের বিশাল শ্রমশক্তিকে স্তালিন মূলধন হিসেবেই দেখেছিল। দুর্গম অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য সেখানে বসতি স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। ১৯২৯ সালে পশ্চিম সাইবেরিয়ার নারিম অঞ্চলের ২ লক্ষ ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটারের পাইনবনে বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। কৃষকদের জমি বাজেয়াপ্ত করে যৌথ খামারে কৃষিজ উৎপাদন, দ্রুত শিল্পায়ন আর কুলাকদের একটা 'শ্রেণী' হিসেবে নিশ্চিহ্নকরণ করে সমাজ ও অর্থনীতির এক নৃশংস রূপান্তরের পরিকল্পনা করা হয়। আঞ্চলিক নেতৃত্ব যৌথ খামারের অবাস্তবিক সংখ্যায় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। কুলাকদের বিদ্রোহকে দমন করতে প্রায় ২০ লক্ষ কুলাককে দুর্গম অঞ্চলে নির্বাসিত করা হয়, ৬০ লক্ষ কুলাক ক্ষুধার জ্বালায় মারা যায়। স্তালিন কুলাকদের নিশ্চিহ্ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ --- কুলাকদের সপরিবারে নির্বাসিত করা হয় এমনকী শাসকদের পক্ষে থাকা কুলাকদের জেলার বাইরে স্থানান্তরিত করা হয়। একটু ধনী কৃষকদের থেকে তাদের শীতের কাপড়, দামি চা, মহিলাদের পোশাক, এমনকী জুতো পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে তাদের নিঃস্ব করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩০ সালে প্রায় ২৫ লক্ষ কৃষক প্রায় ১৪ হাজার বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনায় অংশ নিয়েছিল। এই 'কুলাক'রাই স্তালিনের শ্রমশিবিরে বন্দিদের একটা বড়ো অংশ ছিল। প্রায় ৪০ হাজার বন্দি কেম-উখটা (Kem-Ukhta) সড়ক নির্মাণ করেছিল, যার ফলে সেই অঞ্চলে কাঠ উৎপাদনে বৃদ্ধি হয়। বোগুচাচিনস্ক রেলওয়ে নির্মাণে নিযুক্ত শ্রমের উৎস ছিল বন্দি শিবিরের ১৫ হাজার বন্দি। এই পরিমাণ শ্রমশক্তি আশাতীত ছিল আর প্রয়োজনের তুলনায় ছিল বেশি। আর বন্দি কুলাকদের ব্যবস্থিত স্থানান্তরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। বিশাল সংখ্যক বন্দি কুলাকদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্বাসন, তাদের প্রয়োজনীয় যৎসামান্য খাদ্যসামগ্রী পরিবহণের জন্য ঘোড়া আর ঘোড়ার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পরিবহণ— পরিবহণের মোট খরচ বাড়িয়ে দিল। রেলের প্রায় বায়ুনিরুদ্ধ, ভিড়ে ঠাসা কামরাগুলিতে শ্রমশিবিরে জীবন্ত অবস্থায় পৌঁছানোই ভাগ্যের পরীক্ষা হয়ে গেল। নাজিনো দ্বীপের জনমানবহীন অঞ্চলে যখন বন্দি শ্রমিকদের প্রথম দল পৌঁছাল, তখন সেখানে না ছিল খাদ্য না ছিল কোনো যন্ত্র। বন্দি শিবিরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্মাণের দায়িত্বও ছিল বন্দিদের উপর। প্রথম দিনেই প্রায় ২৯৫ জন বন্দি প্রাণ হারায়। চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে বন্দিদের জন্য যখন সামান্য আটা পৌঁছাল; কেউ নিজের টুপি, কেউ-বা নিজের জ্যাকেটে জল দিয়ে আটা গুলতে শুরু করলো। ক্ষিদের জ্বালায় শুকনো আটা খেতে গিয়ে গলায় আটকে মারা যাওয়ার ঘটনাও ঘটলো। এমনকী বন্দির মধ্যে নরমাংস ভক্ষণের ঘটনাও দেখা গেল। উরালের ৩ লক্ষ বন্দিদের মধ্যে প্রায় ৯২ শতাংশ শ্রমিককে শ্রমশিবির নির্মাণের কাজেই যোগ দিতে হলো। ১৯৩২ সালের দিকে বন্দিদের দ্বারা দুর্গম অঞ্চলে বসতি নির্মাণের কাজ বন্ধ করে তাদের বিভিন্ন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টে পাঠানো হলো। ১৯৩৩ সালে কুজবাস (Kuzbass) খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের ৪৭ শতাংশ ছিল বন্দি শ্রমিক।

স্তালিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম ছিল শ্বেত সাগর— বাল্টিক খাল। ১ লক্ষ ২৬ হাজার জন বন্দি দিয়ে কাজ শুরু হয় আর আনুমানিক ২৫ হাজার বন্দি মারা যায়। ২২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই খাল নির্মাণের জন্য বন্দিদের কোনো আধুনিক যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়নি। স্তালিনের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা হলেও পরিকল্পিত ব্যবহারের পক্ষে এর গভীরতা অপর্যাপ্ত ছিল। তবুও স্তালিনকে কীর্তিমান হিসেবে দেখানোর কোনো খামতি ছিল না।

রাশিয়ার পূর্বদিকে কলিমা নদীর তীরের অঞ্চল কলিমা। শীতকালের গড় তাপমাত্রা -১৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে -৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে। স্তালিনের গুলাগ ক্যাম্পের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত কলিমা। স্তালিন কলিমার সোনার খনিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস হিসেবে দেখছিল। বন্দিদের অনেকেই অত্যন্ত দুর্গম এই অঞ্চলে পৌঁছানোর আগেই মারা যেত। যারা জীবন্ত অবস্থায় কলিমায় পৌঁছাতো, তাদের জীবন মৃত্যুর থেকেও ভয়াবহ হতো।

১৯৩৮ সালে ইউক্রেনের গণিতজ্ঞ মিখাইল ক্র্যাভচুকের শেষ নিবন্ধ যখন প্রকাশিত হচ্ছে সেই সময় তিনি গুলাগের ক্যাম্পে বন্দিদশা কাটাচ্ছেন। নিজের জন্মস্থান থেকে ৪ হাজার কিলোমিটার দূরে পূর্ব সাইবেরিয়ায় কলিমার বন্দি শিবিরে কঠোর শ্রম, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম খাবার আর অত্যধিক খারাপ আবহাওয়া এই গণিতজ্ঞের প্রাণ কেড়ে নেয়।

বন্দিদের দ্বারা নির্মিত কলিমা হাইওয়ে 'Road of bones' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৩২ সালে কলিমা গুলাগ ক্যাম্প ১০ জন বন্দি নিয়ে শুরু হয়েছিল, সাত বছর পর ১৯৩৯ সালে বন্দির সংখ্যা হয় প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার। গুলাগ-ফেরত রাশিয়ার লেখক ভারলাম শালামভ (Varlam Shalamov) গুলাগের শ্রমশিবিরে নিজের কষ্টের দিনগুলো স্মরণ করে লেখেন—"All human emotions—love, friendship, envy– concern for one's fellow man, compassion– longing for fame– honesty—had left us with the flesh that had melted from our bodies...." (Kolyma Tales)।

গুলাগ থেকে জীবন বাঁচিয়ে ফিরে আসা এরকম আরও অনেক লেখকের আত্মজীবনী থেকে কলিমার বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা জানা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের দ্বারা মানুষের উপর এই অত্যাচার মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। এই ইতিহাস উদ্ধারে রোমানীয় লেখক মাইকেল সলোমনের আত্মজীবনী 'Magdan',-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আজারবাইজানীয় লেখক আয়ুব বাগিরভ রচিত 'Bitter days of Kolyma'-তে সাইবেরিয়ায় ট্রেনে যাত্রা প্রসঙ্গে লেখেন—"The terrible heat– the lack of fresh air– the unbearable overcrowded conditions all exhausted us. We were all half starved. Some of the elderly prisoners– who had become so weak and emaciated– died along the way. Their corpses were left abandoned alongside the railroad tracks." স্তালিনের জন্য গান না লেখার অপরাধে গায়ক ভাদিম কোজিন ১৯৪৫ সালে কলিমার গুলাগে বন্দি হন। পরবর্তীকালে মাগদান শহরে নির্বাসিত হন। 'Gold - Lost in Siberia' টিভি শো-তে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কোজিন স্মরণ করেন যে,— ইয়াল্টা সম্মেলনে চার্চিল বিখ্যাত গায়ক কোজিনের গান শুনতে চাইলে তাকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক স্তরে স্তালিনের কুকীর্তি ঢাকতে। গুলাগ-ফেরত চিত্রশিল্পী শব্দের পরিবর্তে ছবি দিয়ে কলিমা গুলাগের ভয়াবহতা জনসমক্ষে এনেছিলেন। তার কথায়—"Some may say that the Gulag is a forgotten part of history and that we do not need to be reminded. But I have witnessed monstrous crimes. It is not too late to talk about them and reveal them. It is essential to do so. Some have expressed fear on seeing some of my paintings that I might end up in Kolyma again—this time for good. But the people must be reminded... of one of the harshest acts of political repression in the Soviet Union. My paintings may help achieve this."।

১৯৩০ সালে ছোটোখাটো দোকানদার, হাতের কাজ করে স্বাধীন আয়ের মাধ্যমে বেঁচে থাকা মানুষদের 'সামাজিকভাবে অবাঞ্ছিত', 'সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন' হিসেবে অভিযুক্ত করে অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে যৌথ খামার ব্যবস্থা ও শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করাই উদ্দেশ্য ছিল। ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষকের গ্রাম ছেড়ে শহরে পলায়ন শুরু হলো অর্থাৎ 'পরিযায়ী কৃষক'-এর জন্ম দিল স্তালিনের 'সোভিয়েত রাশিয়া'। শুধু মস্কো আর লেনিনগ্রাদকে কেন্দ্র করে প্রায় ৩৫ লক্ষ কৃষকের ভিড়ে শহরের জনজীবন তখন স্তব্ধ হওয়ার উপক্রম। বিভিন্ন ধরনের সরকারি প্রকল্পে এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা করা হলো। কলকারখানাগুলো উদ্বাস্তু শিবিরে পরিণত হতে লাগলো। উপায় হিসেবে ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩২ সালে দেশের ভেতরেই পাসপোর্টের ব্যবস্থা চালু করা হয়। সমস্ত শহরকে 'Closed' আর 'Open' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পাসপোর্ট ব্যবস্থার ফলে দু'মাসের মধ্যেই মস্কোর জনসংখ্যা ৬০ হাজার কমিয়ে ফেলা হয়, লেনিনগ্রাদে ৫৪ হাজার মানুষকে গ্রামমুখী করা হয়। ১৯৩৩-এর জুন-জুলাই মাসে ৫৪৭০ জন জিপ্সিকে মস্কোতে বন্দি করে সাইবেরিয়ার শ্রমশিবিরে পাঠানো হয়। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে স্বামী-স্ত্রী সিনেমা দেখতে বেরিয়েছেন আর সঙ্গে সঠিক কাগজপত্র না থাকার জন্য স্বামীটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, এক বোন তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ভুল স্টেশনে নেমে যাওয়ার জন্য তাকে গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত হতে হয়— আত্মপক্ষ সমর্থনের নামমাত্র সুযোগ নেই, এতো সময় নষ্ট করার মতো সময় কোথায় কমিউনিস্ট রাশিয়ার? এমনকী অপ্রাপ্তবয়স্কদের পর্যন্ত ছাড় ছিল না সাম্যবাদী রাশিয়ায়। ১৯৩৫ থেকে '৩৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ৫৫ হাজার কিশোর-কিশোরীকে গুপ্ত পুলিশবাহিনী NKVD-র শ্রমশিবিরে পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত, ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর নাম GPU থেকে পরিবর্তন করে NKVD রাখা হয়।

'গুলাগ' ক্যাম্পে ১৯৩৫ সালে যেখানে ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার বন্দি শ্রমিক ছিল, ১৯৪১-এ তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯ লক্ষ ৩ হাজারে। ইয়েজহভের পর বেরিয়া NKVD-র প্রধান হলে দৈনিক ১১ ঘণ্টার কাজ বাধ্যতামূলক করে। আজ যখন বিভিন্ন দেশে শ্রমিক স্বার্থরক্ষার জন্য বামপন্থীরা কুমিরের কান্না কাঁদেন তখন তাদের সোভিয়েত রাশিয়ার 'গুলাগ' ক্যাম্পে শ্রমিকদের ইতিহাস মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে হয়।

২৪ আগস্ট, ১৯৩৯ সালে নাৎসি জার্মানি আর কমিউনিস্ট রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি হলে 'গুলাগ' ক্যাম্পে বন্দির সংখ্যা বাড়ার এক অন্য পথ খুলে যায়। সোভিয়েত সেনা পোল্যান্ডে ঢুকে পোলিশ সেনাকে বিধ্বস্ত করে ২ লক্ষ ৩০ হাজার যুদ্ধবন্দি পায় যার মধ্যে ১৯৪১ আসতে আসতে ৮২ হাজার বেঁচে থাকে। মোট ৩ লক্ষ ৮১ হাজার পোলিশ নাগরিককে 'বিশেষভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষ' হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের 'গুলাগ' ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করে। ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত সেনা সরে গেলে, জার্মান সেনা Katyn-এর জঙ্গলে প্রায় ১৪ হাজার পোলিশ অফিসারের

মৃতদেহ খুঁজে পায়। সোভিয়েত রাশিয়া সেইসময় অস্বীকার করলেও ১৯৪০ সালের এই গণহত্যা, ১৯৯২ সালে এসে রাশিয়ান সরকার সম্পূর্ণভাবে এই গণহত্যার দায় স্বীকার করে।

পোল্যান্ডের দখল নেওয়ার পর বাল্টিক দেশগুলোতে নিজের ঘাঁটি স্থাপন করে রাশিয়া। ১৯৩৯-এর শেষের দিকে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের মস্কোতে ডেকে 'Mutual Assistantce Treaties'-এ সই করিয়ে রাশিয়াকে তাদের দেশে সৈন্য ঘাঁটি স্থাপনের জন্য বলতে বাধ্য করা হয়। তারপরেই সোভিয়েত রাশিয়ার পুলিশ সেই দেশগুলোর সন্দিগ্ধ সোভিয়েত বিরোধী সরকারি কর্মচারী, বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করে। সেই দেশগুলোতে ১৯৪০ সালের জুলাই মাসের নির্বাচনে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার পায়। সোভিয়েত রাশিয়ার পত্রিকা—'Pravda' লিখলো-- ''the sun of the great Stalinist constitution will henceforth be shining its gratifying rays on new territories and new peoples."।

১৯৪১-এর ১৬ মে NKVD-র প্রধান বেরিয়া, স্তালিনকে এক চিঠিতে লেখে—''clean up regions recently integrated into the U.S.S.R. and remove all criminal– socially alien– and anti-Soviet elements." সোভিয়েত সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাল্টিক দেশগুলোর স্বাধীনতার অস্ত হয় আর অত্যাচারের এক নতুন যুগের সূচনা হয়। সেই বছর ১৩-১৪ জুন রাত্রেই হাজার হাজার জমির মালিক, পুরাতন সরকারি আধিকারিকের পরিবারকে নির্বাসিত ও হত্যা করা হয়। নির্বাসনের প্রক্রিয়ার সময় তাদের খাদ্যের ব্যবস্থার কোনো দায়িত্ব NKVD নেয়নি— নির্বাসিত পরিবারগুলো কয়েক মাসের জন্য মাত্র ১০০ কেজি খাদ্য নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিল!

১৯৪১-এর জুলাই মাসে যখন পশ্চিমদিক থেকে জার্মান সেনা ধেয়ে আসছে , ১৩৫টি জেলখানা ও ২৭টা শ্রমশিবিরের ৭ লক্ষ ৫০ হাজার বন্দিকে রাশিয়ার পূর্বপ্রান্তে স্থানান্তরিত করা হয়। এইসময় গুলাগের বন্দিদের ৬০০ মাইলের পথ খালি পায়ে পাড়ি দিতে হয়েছিল। সময়ের অভাবে যেখানে গুলাগ ক্যাম্পকে খালি করা সম্ভব হতো না, সেখানে খুব সহজ উপায় অবলম্বন করা হতো— বন্দিদের গুলি করে হত্যা। NKVD পশ্চিম ইউক্রেনে ১০ হাজার বন্দিকে হত্যা করে— জার্মান সৈন্যরা সেই এলাকার দখল নেওয়ার সময় কয়েক ডজন গণকবর খুঁজে পায়। গুলাগ লেবার ক্যাম্পের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যেক বছর দেড় থেকে আড়াই লক্ষ বন্দির মৃত্যু হয়। ১৯৪১ থেকে '৪৩ সালের মধ্যে অসুস্থতার জন্য বা হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রায় ৬ লক্ষ গুলাগ ক্যাম্পের বন্দির মৃত্যু হয়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একদিকে বিশ্বশান্তির জন্য মিত্রশক্তির সদস্য সোভিয়েত রাশিয়ার ক্রিয়াকলাপ দেখা যাচ্ছে তখন সেই দেশেরই অসংখ্য মানুষ 'শান্তি' থেকে দূরে 'গুলাগ' ক্যাম্পে জীবন কাটাচ্ছে।

১৯৪৫ সালে 'গুলাগ' ক্যাম্পে বন্দি সংখ্যা একলাফে অনেকটাই বেড়ে যায়। কারণ যেসব সোভিয়েত সৈন্য শত্রুসৈন্যের হাতে কিছুকাল বন্দি থাকার পর মুক্ত হয়েছিল, তাদেরও ঠাঁই হয় গুলাগের শ্রমশিবিরে! সন্দেহ করা হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে অনেকে শত্রুদের গুপ্তচর থাকতে পারে বা তাদের মধ্যে সোভিয়েত-বিরোধী মানসিকতার জন্ম হয়েছে। তার জন্য শত্রুর হাত থেকে সোভিয়েত সৈন্যরা নিষ্কৃতি পেলেও, তার নিজের দেশের কমিউনিস্ট শাসকের সন্দেহ থেকে তাদের রেহাই নেই। যে অঞ্চলগুলো জার্মান সেনা কিছুকাল দখল নিয়েছিল সেই সমস্ত অঞ্চলের সাধারণ নাগরিককেও সন্দেহের চোখে দেখে সেখানে কয়েকশো 'Control & filtration camp' খোলা হয় যার প্রত্যেকটিতে ১০ হাজার মানুষকে বন্দি রাখার ব্যবস্থা ছিল। যে সময় স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের উদ্‌যাপন করছে, তখন রাশিয়ার ২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে যৌথ খামারের প্রায় ৫৩ হাজার কৃষককে গুলাগে পাঠানো হয় রুটি বা শস্য চুরির অপরাধে— এর মধ্যে মহিলারাও ছিল। মহান নভেম্বর বিপ্লবের প্রায় তিন দশক পরেও এই ছিল সাম্যবাদী সমাজের আদর্শ সোভিয়েত রাশিয়ার পরিস্থিতি! ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে গুলাগ ক্যাম্পে প্রায় ৫ লক্ষ বন্দি ছিল যার মধ্যে প্রায় ৩০ হজার শিশু। সোভিয়েতের অধিকারভুক্ত বাল্টিক দেশগুলোর তথাকথিত 'সোভিয়েত-বিরোধী' হাজার হাজার মানুষের গন্তব্য হতে থাকে গুলাগের শ্রমশিবির! গুলাগের ভেতরেও বন্দিদের মধ্যে অপরাধ ও হত্যার প্রবণতা বাড়তে থাকে— চরম অমানবিক পরিস্থিতিতে মানবিকতার বিপর্যয়ের সমস্ত দিক ছুঁয়ে দেখার নাম যেন 'গুলাগ'।

'গুলাগ'-এ বিপুল সংখ্যক বন্দিদের চাপ, মহামারী, অপরাধের বৃদ্ধি সামলাতে যখন কমিউনিস্ট শাসক হিমশিম খাচ্ছে, তখন বাধ্য হয়ে কিছু বন্দিকে সময়ের আগেই মুক্তি দেওয়া হয় কিন্তু এই বিশাল সংখ্যক শ্রমশক্তি থেকে উদ্ভূত লাভ ও উৎপাদনকে অব্যাহত রাখতে শ্রমিকদের মধ্যে পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়। মানুষকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা মার্ক্সবাদের ফল— 'গুলাগ'।

সমাজকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার ফল 'গুলাগ'। মালিকপক্ষের লাভের অনিয়ন্ত্রিত লোভের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে পথের সন্ধান দেয় মার্ক্সবাদ, তা আসলে এক মরীচিকা। এই পথে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যে নরকের দরজা খোলে তার নাম 'গুলাগ'।

স্তালিনের মৃত্যুর পর স্তালিনীয় নীতি থেকে ধীরে ধীরে সরতে শুরু করেন ক্রুশ্চেভ। গুলাগের বন্দিদের ধীরে ধীরে মুক্তি দেওয়া হয়। অবশেষে ১৯৬০ সালের ২৫ জানুয়ারি সরকারিভাবে গুলাগের অবলুপ্তি হয়। পিছনে থেকে যায় মার্ক্সবাদের নামে এক কমিউনিস্ট শাসকের নৃশংসতার ইতিহাস, যার নাম 'গুলাগ'। গুলাগের নৃশংসতাকে আড়াল করতে প্রতিবছর 'মে দিবস' পালনের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে শ্রমিক-দরদি দেখানোর প্রোপাগান্ডা বিশ্বজুড়ে চালায় বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি, কিন্তু গুলাগের আর্তনাদ তাদের প্রোপাগান্ডায় জল ঢালার জন্য যথেষ্ট।

তথ্যসূত্র : (১) The Black Book of Communism—Harvard University Press (1999), (২) The Gulag Archipelago—Aleksandr I. Solzhenitsyn

বিগত সাত দশকে রাজনৈতিক আনুগত্যে গ্রাম ও শহরের বৈপরীত্য

ডাঃ মধুসূদন পাল

ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল কমিউনিস্টদের সমর্থনে ইংরেজ, গান্ধী, নেহরু ও জিন্নাদের চক্রান্তে ও স্বার্থে। সেই বাধ্যবাধকতা থেকে হিন্দু বাঙ্গালির স্বার্থে এবং বাংলাদেশ থেকে আসা অগণিত হিন্দু বাঙ্গালি উদ্‌বাস্তু মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। এরপর বিগত শতকের ষাটের দশকে দু'টি অত্যন্ত স্বল্প সময়ের যুক্তফ্রন্ট ছাড়া ১৯৭৭-এর মধ্যভাগ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে শাসন করেছে কংগ্রেস। একই সঙ্গে কেন্দ্রেও ক্ষমতাসীন ছিল কংগ্রেস দল। অনেক যোগ্য ও সৎ নেতৃত্ব থাকলেও কেন্দ্রে নেহরু ও ইন্দিরার ষড়যন্ত্রে পশ্চিমবঙ্গে সুশাসনের অভাব ছিল সুস্পষ্ট। তাই জনগণের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল। তারা সরকারের পরিবর্তন চেয়েছিল গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে। পরিবর্তনের দাবি উঠেছিল মূলত গ্রামাঞ্চলে— যদিও আলোকপ্রাপ্ত কলকাতা কিংবা লাগোয়া উন্নত এলাকার মানুষ সরকারি উন্নয়নের যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে থাকে। দেখা গেছে, তৎকালীন বিরোধী দল সিপিআই, পরে সিপিআই(এম), ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলের প্রার্থীরা বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন গ্রামাঞ্চল থেকেই। অর্থাৎ পথ দেখিয়েছে গ্রাম, শহর নয়। সেখানে তখনো কংগ্রেসের একাধিপত্য।

বড়ো পরিবর্তন এল জরুরি অবস্থার পর ১৯৭৭ সালে। বামফ্রন্ট সরকারের হাত ধরে। বামফ্রন্ট হলেও সেই রাজনৈতিক জোট ও রাজ্য সরকারে প্রায় নিরঙ্কুশ একাধিপত্য ছিল সিপিএমের। সেই সময়েও মহানগরী কলকাতার আধিপত্য কংগ্রেসেরই ছিল। শহরের লোকেদের রাজনৈতিক আনুগত্যের পরিবর্তন ঘটল বামফ্রন্টের বলা ভালো সিপিএমের দিকে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে। বিগত পাঁচ বছরে বুদ্ধিমান ও চেতনায় অগ্রবর্তী কলকাতার মানুষেরা বুঝে গিয়েছিল বামফ্রন্টের প্রতি আনুগত্যে তাদের প্রভূত লাভ। এই প্রবণতা বজায় ছিল ২০১১ পর্যন্ত। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের রাজত্বকালে সংঘটিত হয়েছে বহু নারকীয় ঘটনা। যেমন মরিচঝাঁপি, সাঁইবাড়ি, বানতলা, আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী হত্যা ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষা থেকে শুরু করে সর্বত্র রাজনীতীকরণ এই সরকারের কৃতিত্ব। তাছাড়া, ভোটের স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের এদেশে থাকার ব্যবস্থা, মুসলমান তোষণ— সব তাদের কৃতিত্ব। তবুও বামফ্রন্টের প্রতি কলকাতা শহরের তথাকথিত শিক্ষিত, অভিজাত মানুষদের রাজনৈতিক অনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত যদিও প্রায় ২০০১ থেকেই বাম শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংহত হতে থাকে গ্রামাঞ্চলগুলিতে। ধীরে ধীরে মেদিনীপুরের কেশপুর, গড়বেতা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, নেতাই দিয়ে বামফ্রন্টের পতনের পটভূমি তৈরি হতে লাগল জোরকদমে। বামশাসনের পতন পূর্ণতা পেল ২০১১ সালে। অনেকের মতে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারিতে নির্বাচন হয়েছিল বলেই বামফ্রন্ট সরকারের দুর্ভেদ্য সংগঠনে ফাটল ধরানো সম্ভব হয়েছিল। সেদিন বামফ্রন্ট সরকারের বৈজ্ঞানিক রিগিঙের মেশিনারি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল কমিশনের সক্রিয়তায়। ফলে পরিবর্তন এসেছিল— মানুষ হাঁফ ছেড়ে ফেলেছিল স্বস্তির শ্বাস।

মনে রাখতে হবে, এই পরিবর্তনের প্রায় সম্পূর্ণ কৃতিত্ব গ্রামাঞ্চলের লড়াকু মানুষের। ২০১১-তে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এল তৃণমূল কংগ্রেস। শহরের মানুষজন তখনও বামপন্থায় গভীরতর আস্থাশীল। তারপর তারা তাদের স্বার্থের তাগিদেই ধীরে ধীরে পুরানো বাম জামা বদলে তৃণমূল জামা পরতে শুরু করে। তৃণমূল কংগ্রেস পনেরো বছরেই ৩৪ বছরের বাম শাসনকে স্বেচ্ছাচারিতা, অপশাসন, অপসংস্কৃতি ইত্যাদিতে ছাড়িয়ে যায়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যখন গ্রামাঞ্চল তৃণমূল শাসককে প্রায় উপড়ে ফেলার ব্যাপারটি প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে, তখন শহর কলকাতা এই সরকারকে ১১টি আসনেই জয় নিশ্চিত করেছে। এছাড়া কলকাতার লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলীর অধিকাংশ আসন পেয়েছে তৃণমূল বা তোলামূল কংগ্রেস। কিন্তু উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল ও পূর্ব মেদিনীপুরে বিরোধী বিজেপি অনেক ভালো ফল করে। অনেক আসনেই মাত্র ২ থেকে ১০ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিরোধী বিজেপি পরাজিত হয়। এছাড়া তৃণমূলের জয়ের পেছনে ছিল, জালভোট, ছাপ্পা ভোট, আইপ্যাক নামক ভোটকুশলী সংস্থার নানারকম জালিয়াতি আর নির্বাচন কমিশনের শাসকদলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব।

২০২৬ সালের নির্বাচনেও দেখা গিয়েছে— হীরকরানি ও তার চেয়ে এই চিটিংবাজদের সরকারকে উৎখাত করতে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মরণপ্রাণ সংগ্রাম। তারা ৯০ শতাংশের বেশি ভোট দিয়ে নজির সৃষ্টি করেছে। ভয়-ভীতি কাটিয়ে কীভাবে অত্যাচারী শাসকের বিপক্ষে ভোট দিয়ে উৎখাত করতে হয়— প্রথম পর্বের গ্রামাঞ্চলের মানুষের আচরণ তার প্রমাণ। তাদের দেখেই দ্বিতীয় পর্বে হাওড়া, হুগলী, দুই ২৪ পরগনা, বর্ধমানের সঙ্গে কলকাতার মানুষ কিছুটা হলেও সম্বিৎ ফিরে পেয়ে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। পথ দেখিয়েছে কিন্তু গ্রাম।

প্রশ্ন হলো, পরিবর্তনের প্রশ্নে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এই আচরণ কেন? শহরের শিক্ষিতের হার অনেক বেশি। দেশের ভালো-মন্দের বা জ্ঞান তো তাদেরই বেশি। অন্তত, সাধারণ জনগণতো তাই মনে করে। তাহলে শাসকের নোংরামি, কুশাসন দেখেও তাদের মধ্যে পরিবর্তন আগে শুরু হয় না কেন? কুশাসন, অন্যায়-অত্যাচার কি তারা বোঝে না? আসলে তারা সব জেনেও পরিবর্তনের ঝুঁকি নিতে চায় না, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব থেকে। শহরের ধনী বা গরিব সবাই সরকারি সাহায্যের উচ্ছিষ্ট বেশি ভোগ করে। অবশ্য মহাভারতের সময় থেকে কৌরবদের সভাপারিষদ, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রমুখ জানতেন পাণ্ডবদের উপর কী রকম অন্যায় অত্যাচার করেছে দুর্যোধনরা। তারা বিবেকের গান গেয়েও প্রতিরোধে এগিয়ে আসেনি, রাজানুগ্রহ হারানোর আশঙ্কায়। এই কারণেই রাজসভায় প্রকাশ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখেও তারা হিরন্ময় নীরবতা পালন করেছিল। ঠিক, যেমনটা আজকে করে চলেছে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী অথচ দুর্বুদ্ধিজীবীর দল। ক্ষমতা হস্তান্তর হলেই এরাই সর্বপ্রথম ক্ষমতার অলিন্দে যাবে নতুন শাসকের অনুগ্রহ পেতে। □

তৃণমূলনেত্রীর দুর্ভেদ্য দুর্গে ফুটল পদ্ম

বিপ্লব বিকাশ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ৪ মে দিনটি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। গত দেড় দশক ধরে রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা আঞ্চলিক শক্তিগুলিকে পরাজিত করে ভারতীয় জনতা পার্টি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। কলকাতার অলিগলি থেকে শিলিগুড়ির পাহাড়ি হাওয়া— সবখানেই আজ পরিবর্তনের সুর। তৃণমূলনেত্রীকে অজেয় বলে মনে করা রাজ্যে তার দুর্ভেদ্য দুর্গ অবশেষে ভেঙে পড়েছে এবং রাজ্যের মানুষ এক নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছে। এই জয় শুধু আসনের সংখ্যা নয়, বরং গত কয়েক বছরে প্রশাসন ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে জমে থাকা মানুষের গভীর অস্থিরতারই বহিঃপ্রকাশ। অনেকের মতে, প্রশাসনিক কাঠামোতে পক্ষপাতিত্ব বেড়েছিল এবং জনজীবনে বিশৃঙ্খলার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

এই নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আর শুধু তথাকথিত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের উপর নির্ভর করে থাকতে রাজি নয়। তৃণমূল কংগ্রেস 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-সহ একাধিক দান খয়রাতির প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেদের জমি ধরে রাখার চেষ্টা করলেও তৃণমূল স্তরে দুর্নীতি, কাটমানি, তোলাবাজি এবং বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ সরকারকে বিপাকে ফেলেছিল। মানুষের মনে ধীরে ধীরে এই ধারণা জন্মায় যে, রাজ্যের জন্য এমন একটি উন্নয়ন মডেলের প্রয়োজন যা কেবল ভাতাভিত্তিক সুরক্ষা নয়, বরং শিল্পায়ন, নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্বদান করবে। বিজেপি এই মনস্তত্ত্বকে বুঝে 'সোনার বাঙ্গলা' নির্মাণের স্বপ্নকে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হয়।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা গেছে দক্ষিণবঙ্গের সেইসব জেলায়, যেগুলিকে এতদিন তৃণমূলের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি বলে মনে করা হতো। হুগলী, হাওড়া এবং দুই ২৪ পরগনা— এই অঞ্চলগুলিতে ভোটাররা নীরবে তাদের রায় বদলে দিয়েছেন। আরজি কর এবং সন্দেশখালির মতো ঘটনাগুলি বিশেষত মহিলা ভোটারদের নিরাপত্তার প্রশ্নে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। অন্যদিকে, যুব সমাজ বেকারত্ব ও রাজ্য থেকে ক্রমবর্ধমান বহির্গমনকে বড়ো ইস্যু হিসেবে দেখেছে। 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের ধারণা সেইসব মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, যারা আবার বাংলাকে দেশের শিল্পকেন্দ্র হিসেবে দেখতে চান।

পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে প্রায় ২১০টি আসনের ফলাফল মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটারদের উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল যে, মুসলমান ভোটই এখানে নির্বাচনের ফল নির্ধারণ করে এবং বিজেপির পক্ষে সাফল্য পাওয়া কঠিন। এই ধারণাকে ভেঙে দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের মধ্যে এক নতুন রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়েছে। সংগঠিত প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা একত্রিত হয়ে একটি বৃহত্তর সংহত রূপ নিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কঠোর নজরদারি, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং বুথ স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে ভোটারদের মধ্যে ভয় অনেকটাই কমেছে। ফলস্বরূপ, স্বাধীনতার পর অন্যতম সর্বোচ্চ হারে ভোটদান দেখা গেছে, এবং সেই অংশগ্রহণই এই পরিবর্তনের ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

> **দীর্ঘদিন ধরে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, মুসলমান ভোটই পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ফল নির্ধারণ করে এবং এই অবস্থায় বিজেপির পক্ষে সাফল্য পাওয়া কঠিন। এবারের বিধানসভা নির্বাচন এই ধারণাকে ভেঙে দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের মধ্যে এক নতুন রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়েছে।**

এই জয় বিজেপির জন্য যতটা তাৎপর্যপূর্ণ, ততটাই চ্যালেঞ্জপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে এবং এখানকার মানুষ দ্রুত সমর্থন যেমন দেয়, তেমনি দ্রুত জবাবদিহিও দাবি করে। নতুন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা, আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এটি আত্মসমালোচনার সময়। যদিও তিনি ও তার দল ধ্বংসাত্মক রাজনীতির জন্য কুখ্যাত। জেহাদি শক্তিকে উসকে দিয়ে আগামীদিনে এরাজ্যকে অশান্ত করে তোলার প্রয়াস চালাতে পারেন তৃণমূলনেত্রী। দুর্নীতি দমন থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তৈরি অরাজকতার মোকাবিলায় প্রথম থেকেই তৎপর থাকতে হবে নবনির্বাচিত রাজ্য সরকারকে। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর রাইটার্স বিল্ডিংস্ সংস্কারে জোর দেওয়া হবে। আগামীদিনে নবান্নের পরিবর্তে রাইটার্স বিল্ডিংস্ থেকে পুনরায় পরিচালিত হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ আজ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে— মানুষ শান্তি, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা চায়। রাজ্যবাসী বিশ্বাস করে যে, নতুন সরকার সেই প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৭৪)

প্রসিদ্ধি পরাঙ্মুখতা

আত্মপ্রচার, আত্মপ্রশংসায় বিমুখতার ছবি ডাক্তারজীর মধ্যে আগেও দেখা গেছে। তা নিজের ক্ষেত্রে বা সঙ্ঘের ক্ষেত্রে যেখানেই হোক না কেন। এক বার সেই সঙ্ঘের এক পথ সঞ্চলনে কোনো একজন ফোটোগ্রাফার ছবি তোলার জেদ ধরলে ছবি না তুলতে ডাক্তারজীর শত অনুরোধ না শুনলে ডাক্তারজী হাতের ছাতাটি খুলে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। ডাক্তারজীর দর্শন ছিল আত্মপ্রসিদ্ধির দিকে একবার মন আকৃষ্ট হলে ধ্যেয় পথ, রাষ্ট্রসেবার লক্ষ্য থেকে সে বিচ্যুত হয়। নিজের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে তো তিনি যথেষ্ট কঠোরই ছিলেন। ১৯৩৫ সালেই কোনো এক সময়ে মিরজের দামোদরপন্ত ভট্ট ডাক্তারজী কাছে এক আবদার বা আগ্রহ পত্র পাঠান। যাতে তিনি ডাক্তারজীর পত্রের উত্তর দিয়ে উঠতে না পারায় ভট্ট অবিলম্বে আরেকটি পত্র পাঠান। কেউ তার জীবনচরিত্র ছাপুক, ডাক্তারজী তা একদম চাইতেন না। তিনি চাইতেন শুধু কাজের প্রচার হোক— তাও সমবেত শক্তি দ্বারা। তাই এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত বিনম্র অসম্মতি জ্ঞাপক পত্রই পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি যাতে কষ্ট বা দুঃখ না পান তার জন্য ডাক্তারজী অত্যন্ত শালীনতা ও সহমর্মিতার বয়ানে লিখেন— 'আপনার মনে আমার এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জন্য যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রয়েছে তার জন্য আমি হৃদয় থেকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনার ইচ্ছা আমার জীবনচরিত প্রকাশ করার। কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমি এত বড়ো বা আমার জীবনে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে, যা মুদ্রিত করা যায়।

সেই সঙ্গে আমার অথবা সঙ্ঘের যে ধরনের ফোটো আপনি চেয়েছেন তাও নেই। সংক্ষেপে এইটুকু বলতে পারি যে লেখার উপযুক্ত জীবন চরিতের মালিকার মধ্যে আমার জীবনচরিত একেবারে বেমানান'। ডাক্তারজী এই পত্র লিখেছিলেন ১৯৩৫ -এর ১২ জুলাই।

(৭৫)

এক অদ্ভুত দূরদর্শিতা

ও

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি

সঙ্ঘকার্য বৃদ্ধির সঙ্গে তার প্রভাবও ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। হিন্দুত্বের রক্ষার জন্য অনুশাসনবন্ধ, আত্মবল সৃষ্টিকারী এমন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সকলের মনে হচ্ছিল। অপরদিকে হিন্দু মহিলাদের উপরে মুসলমানদের অত্যাচারের নানা কাহিনি যখন শোনা যাচ্ছিল তখন যেসব হিন্দু মহিলা সঙ্ঘের কথা জেনেছিলেন তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হলো যে সঙ্ঘ শুধু হিন্দু তরুণদের জাগ্রত, প্রশিক্ষিত করবে কেন, নারীদের জাগরণও দরকার। সমানভাবে তাদেরও হিন্দুত্ব রক্ষা ও আত্মরক্ষায় স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। এমন চিন্তার প্রেক্ষিতে ১৯৩৬ সালে একজন তরুণ স্বয়ংসেবকের মা শ্রীমতী লক্ষ্মীবাঈ কেলকর ওয়ার্ধায় আপ্পাজীর বাড়িতে ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ডাক্তারজীর কাছে মহিলাদের মধ্যেও আত্মরক্ষায় সক্ষম প্রশিক্ষিত নারী বাহিনীর সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা উপস্থাপন করেন। তিনি ডাক্তারজীকে প্রশ্ন করেন— 'আপনি তরুণদের যেরকম শিক্ষিত করেন এবং ধ্যেয়নিষ্ঠার শিক্ষা দেন, মেয়েদের সেরকম কেন শেখান না?' ডাক্তারজী খুব সহজভাবে বললেন— 'এখন তো আমরা শুধু পুরুষদের জন্যই কার্যক্রম রেখেছি।' এবার শ্রীমতী কেলকর বিকল্প একটি পথের কথা বললেন— 'আপনাদের শিক্ষণ আমাকে শেখাবার অনুমতি আমার পুত্রকে দিন। সে যদি আমাকে শিখিয়ে দেয়, তাহলে আমি অন্য মহিলাদেরও শিখিয়ে দেব'। কিন্তু ডাক্তারজী রাজি হলেন না। এবার শ্রীমতী লক্ষ্মীবাঈ অত্যন্ত বিনম্রভাবে বললেন— 'মহিলারাও পরিবারের মতো রাষ্ট্রের অঙ্গ। আপনাদের সংগঠনের চিন্তাধারা যদি মায়েদের কাছেও পৌঁছে যায়, তাতে সঙ্ঘেরও উপকার হবে'। এমন কথা তিনি কয়েকবার পুনরুক্তি করেন। এ ধরনের কাজ করার তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকলে ডাক্তারজী বললেন— 'কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে যদি আপনারা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকেন তাহলে আপ্পাজী যোশী আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন'। তবুও ডাক্তারজী সঙ্ঘের মধ্যে আলাদা মহিলা বিভাগের অনুমতি দেননি; শ্রীমতী লক্ষ্মীবাঈ পরে পরামর্শের জন্য ডাক্তারজীর কাছে এলে ডাক্তারজী ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যে, সংস্থার নাম সঙ্ঘ থেকে ভিন্ন কিন্তু সমানার্থক হওয়া উচিত। মহিলাদের সম্মুখে এ কাজ করতে গিয়ে কী কী ধরনের অসুবিধা আসতে পারে তারও আভাস দেন, কিন্তু শ্রীমতী লক্ষ্মীবাঈ কেলকর তাঁর সংকল্পে অত্যন্ত দৃঢ় থাকার কারণে তিনি ডাক্তারজীকে বললেন— 'আপনার আশীর্বাদ ও ঈশ্বরের কৃপা থাকায় আমার মনে হয় না যে আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।' এবার ডাক্তারজী বাইরে থেকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। ১৯৩৬ সালের বিজয়া দশমীর পুণ্যলগ্নে স্থাপিত হলো 'রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি'।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস